কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

জুলাই '৮৩

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

প্রস্তুতি শুরু হয়েছে

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

3য় বর্ষ 3য় সংখ্যা ॥ জুলাই, 1983

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর

সম্পাদক : রবীন বল

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। তোমরা যারা পরীক্ষা দিয়েছিলে, তারা সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছ আশা করি। এবছর মধ্যশিক্ষা পর্ষদ একটি ঘোষণায় বলেছেন, যারা বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ের প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে শতকরা 45 নম্বর পেয়েছে, তারাই উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হতে পারবে। এই ঘোষণাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান বিষয়ে যারা পঠন-পাঠন চালিয়ে যেতে চাও তাদের যথেষ্ট সচেতন হয়ে পড়াশোনায় অগ্রসর হতে হবে।

'যা আমি দেখেছি' বিভাগটি এই সংখ্যা থেকে শুরু করা হলো। প্রকৃতিতে বা নিজস্ব পরিবেশে তোমরা যে যা পর্যবেক্ষণ করেছ, ছবি সমেত (ফটো বা আঁকা) তার বিবরণ লিখে পাঠাও। এই বিভাগে আমরা নিয়মিত লেখা প্রকাশ করতে চাই।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় 1
চিঠিপত্র 2
দপ্তর থেকে
গিনসেং ॥ সমরজিৎ কর 3
বিজ্ঞান-সংবাদ ॥ 8
বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প
নিজের মুখোমুখি ॥ অরুণোদয় ভট্টাচার্য 21
পড়াশোনা
গ সা গু এবং ল সা গু নির্ণয় ॥ অসীম মুখোপাধ্যায় 33
রসাল রসায়ন ॥ অমরনাথ রায় 42
জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ (14) ॥ তারকমোহন দাস 5
ছবিতে গল্প
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 17
খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 18, 19
জুলভার্নের টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী ॥ গৌতম কর্মকার : 54, 55
হাবুলের বিজ্ঞানভাবনা ॥ ধীরেন বল 56
চলন্ত পাদুকা ॥ উজ্জ্বল ধর 39
প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 28
পশু পাখি উদ্ভিদ
ধনেশ পাখিদের কথা ॥ অজয় হোম 14
কচুরিপানা ॥ মিহির সরকার 36
ঘুমন্ত হাঙ্গর ॥ তৃপ্তি রায় 13
উপন্যাস
অল ইণ্ডিয়া কমন পিপ্‌লস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 9
সবুজ বনের গান ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 37
জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
কলম্বাসের তিনশ বছর আগে ॥ অমিতাভ সেন 7
রাতের প্রাণীরা কি করে দেখে ? ॥ অরূপরতন ভট্টাচার্য 40
উত্তর আকাশের তারামণ্ডল ॥ বিমান বসু 29
আমরা ভুলি কেন ? ॥ পৃথা বল 24
ভাষার জন্মকথা ॥ সুমিত্রা দে 32
একাধারে খাদ্য ও পানীয় ॥ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 43
জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ ॥ বরুণ মজুমদার 20
ফ্লজিস্টন ॥ অনন্তকুমার দত্ত 36
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
উইলিয়ম হার্ভে ॥ প্রদীপকুমার দাস 44
আবিষ্কারের কাহিনী
বেরিবেরি রোগের আবিষ্কার ॥ সুনীল সরকার 26
নিজে কর
জলের নিচে আগ্নেয়গিরি ॥ হিমাদ্রিআদিত্য চৌধুরী 47
যা আমি দেখেছি
পিঁপড়ের লড়াই ॥ জ্যোতিষ সরকার 52
ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তরদাতাদের নাম 45
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসা 46, প্রশ্নোত্তর 46
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তর 46
নকল রক্ত ॥ দেবব্রত রায় 49
অন্তর্বর্তী সংযোগ ॥ কাকলি রায় 50
বিচিত্র কফিন ॥ উত্তমকুমার দাস 49
ডিল্টুর কেরামতি ॥ সোমনাথ সেনগুপ্ত 48
জানা-অজানা (1) চন্দন রুদ্র, (2) সৌমিত্র মজুমদার
ভেবে ভেবে বল ॥ বিমল চন্দ 47
শব্দকূট ॥ বিশ্বজিৎ সরকার 51
শব্দকূটের উত্তর 51

সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

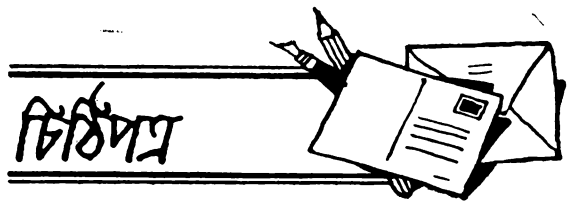

প্রসঙ্গ ঃ ঘনাদা-ক্লাব

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

বৈশাখ 1390 সংখ্যায় দেখলাম মৌ-কা-সা-বি-স আবার প্ররোচিত করেছে ঘনাদাকে। এবং এ-ক্ষেত্রে ফল যা হবার তাই হয়েছে। এমন টাইট খাবার পরেও মৌ-কা-সা-বি-স আবার এক বিখ্যাত প্রকাশকের ঠিকানায় ঘনাদার নামে চিঠি দেবে কিনা জানিনা। যদি ধরেও নিই ওদের (?) আহাম্মুকির শিক্ষা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, তাহলে ফের চিঠি দেবে। কিন্তু তার আগেই একজন পাঁড় ঘনাদা-ভক্ত হিসেবে আমি একটা প্রস্তাব আনতে চাই। অবিলম্বে একটা ঘনাদা-ক্লাব গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করছি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই ঘনাদা-ক্লাব? একি শার্লক হোম্‌স্‌-ক্লাবের অনুকরণ? উত্তরে বলি, ঘনাদার জুড়ি নেই যখন, অনুকরণ একেবারেই অচল। আসলে, প্রয়োজন—অনুসন্ধান, পুণ্য স্মৃতিরক্ষা, ঘনাদার বংশপঞ্জী রচনা, ঘনাদার বিশ্ব ও মহাবিশ্ব ভ্রমণের মানচিত্র তৈরি ইত্যাদি। সবার আগে এখনই তো লালবাজার স্ট্রীটে এক টুকরো ইটালিয়ান মার্বেল খুঁজে বার করতে হবে। তার ওপর খোদাই করিয়ে নিতে হবে—শ্রীঘনশ্যাম দাস (ঘনাদা), 72নং বনমালী নস্কর লেন।

তা বলে কাজটা এখানেই শেষ নয়। কোথায় বসানো হবে ফলকটা?—এই সব কাজ, গবেষণা, অভিযান নিয়েই ঘনাদা-ক্লাবের ঘনাদা-ভক্তরা মেতে থাকবেন। নিয়মিত মিটিং করবেন তাঁরা। অবশ্যই ঘনাদা-অ্যাপ্রুভড্‌ মেনু অনুযায়ীই ইটিং করে মিটিং সার্থক হবে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় ঘনাদা অনেক দিন পরে দেখা দিয়েছেন। সেইজন্যেই দাবী করছি, এখন কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানেই তার একটা পাতায় খানিকটা জায়গা যদি ছেড়ে দেন ঘনাদা-ক্লাব গঠনের জন্যে তা হলে ঘনাদা- ভক্তরা অবিলম্বে যোগাযোগ করতে পারেন নাম-ঠিকানা পাঠিয়ে। তারপর একটা দিনক্ষণ ঠিক ক'রে মিলিত হওয়া যাবে। ঘনাদা-ক্লাবের কার্যনির্বাহ পদ্ধতি ও প্রোগ্রামগুলো তখনই স্থির হবে।

ইতিমধ্যে সকলেই ভাবতে থাকুন, ঘনাদা-ক্লাবের সীম্বল কি হবে, মানে সভ্যদের ব্যাজ, ঘনাদা-ক্লাব ভবনের পতাকায় কোন্ প্রতীক শোভা পাবে। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ, তাঁকে জোর করে পৃষ্ঠ-পোষকের ভূমিকায় টেনে আনার জন্যে যেন গোঁসা না করেন। ঘনাদা-ক্লাব গঠনে আপনার পত্রিকা অগ্রণী ভূমিকা নিলে সুধীর নিশ্চয় আপনাকে নিয়মিত ঘনাদার নিত্যনতুন কীর্তিকাহিনী ছাপার অনুমতি দেবেন।

জয়তু ঘনাদা,

প্রস্তাবিত ঘনাদা-ক্লাবের সাধারণ সদস্যপদ প্রার্থী

সিদ্ধার্থ ঘোষ, কলকাতা-29

সম্পাদকের সংযোজন ঃ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের তরফ থেকে জানাই, ঘনাদা-ক্লাব গঠনে আমরা সবরকম সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। আগ্রহী পাঠক-বন্ধুরা পত্রিকা দপ্তরে নাম-ঠিকানা পাঠিয়ে যোগাযোগ করুন। খাম বা পোস্টকার্ডের ওপর লিখবেন—'ঘনাদা-ক্লাব'। প্রাপ্ত নামঠিকানা নিয়মিত প্রকাশিত হবে প্রতি মাসের কাগজে। সেই সঙ্গে আরেকটা কথা, লিখে বা এঁকে ঘনাদা-ক্লাবের সম্ভাব্য প্রতীকটিও পাঠান। ঘনাদা-ক্লাবের প্রথম সভায় ভোটাভুটি করে সবচেয়ে ঘনাদো-চিতটাকেই বেছে নেওয়া হবে। বলাই বাহুল্য ঘনাদা-ক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্যে বয়সটা কোন ফ্যাক্টার নয়। জীবিত বা মৃত—যে-কোন বয়সের লোক যোগাযোগ করুন।

দপ্তর থেকে

গিনসেং

সমরজিৎ কর

শুনলে গল্পের মতোই মনে হয়। গিনসেং এক ধরনের উদ্ভিদ। বিজ্ঞানীরা এই উদ্ভিদটির নাম রেখেছেন 'পানাক্স গিন্‌সেং'। এক সঙ্গে পাঁচটি ফলাকার পাতা। এর ফলগুলি খুদে খুদে। টকটকে লাল। আর শেকড়? আঃ! কি মিষ্টিই না গন্ধ! গাছটি পাওয়া যাবে চীন, রাশিয়া এবং পৃথিবীর নানা অঞ্চলে। চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ বিচিত্র এই উদ্ভিদটিকে জেনে আসছে কম করেও পাঁচ হাজার বছর ধরে। আর তার গুণপনারও যেন শেষ নেই। বিশেষ করে গাছটির শেকড় নিয়ে।

শুনলে অবাক হবে, কোরিয়ার মানুষরা এই গাছটির শেকড়কে বলে 'জীবন শেকড়'। তারা বলে, ঊষর বন্ধুর অঞ্চলে পথ চলতে গিয়ে কোন পথিক যখন ক্লান্ত হয়, পথের পাশ থেকে তখন সে উপড়ে নেয় গিনসেং-এর খানিকটা শেকড়। তুলে নিয়েই মুখে পুরে শেকড়টি সে চিবুতে শুরু করে। আর তার পরক্ষণেই তার মনে হয়, সে এইমাত্র অনেক কিছু খেয়ে উঠল। আর কোন ক্লান্তি নেই। খিদে-তেষ্টা কোথায় চলে গেছে। দীর্ঘ পরিশ্রমের পর বেশ কিছুটা বিশ্রাম নিলে শরীর এবং মন যেমন ঝরঝরে তাজা হয়ে ওঠে, ব্যাপারটা তার কাছে সেইরকমই হয়ে দাঁড়ায় তখন।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা গত কয়েক বছর ধরে এই গাছটির গুণাগুণ জানার জন্যে নানারকম পরীক্ষা চালিয়ে যা বলছেন, সে সব কথা অবাক হওয়ারই মতো। তাঁরা এই উদ্ভিদের আরক তৈরি করেছেন। কয়েকজন টেলি-ফোন অপারেটারকে এই আরক খেতে দেওয়া হয়। একটানা কাজ করতে গিয়ে টেলিফোন অপারেটাররা অনেক সময় ভুলভ্রান্তি করে। আশ্চর্য কাণ্ড! দেখা গেল, আরক খাওয়ার পর তাদের সেই ভুলভ্রান্তি অনেক কমে গেছে। ছাপাখানায় যারা প্রুফ পড়ে, তাদেরও দেওয়া হয়েছিল এই আরক। প্রুফ-পড়ুয়ারা প্রায়ই ভুল করে। কিন্তু গিনসেঙের আরক খাওয়ার পর দেখা গেল, মনের দিক থেকে তারা খুব সতেজ হয়ে উঠেছে। প্রুফ পড়তে গিয়ে তারা ভুল করছে কম। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এটাও লক্ষ্য করেছেন, এই উদ্ভিদটির আরক খাওয়ার পর খেলোয়াড়দের ক্ষমতা এবং দক্ষতা দারুনভাবে বেড়ে যায়। আর এক থেকে দেড় মাস এক নাগাড়ে যারা এই আরক খায়, তাদের শরীর সতেজ হয়, মন হয়ে ওঠে তাজা। খিদে বাড়ে, খাবারের উপর বিতৃষ্ণা থাকে না। বাড়ে মনের জোরও। যাদের রাতে ঘুম হয় না, তারা বেশ ভালভাবে একটানা অনেকটা সময় ঘুমতেও পারে।

শুধু মানুষই নয়। পশুদের উপরও পরীক্ষা চালিয়েছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। গিনসেং খাওয়ানোর পর পশুরা নানারকম সংক্রামক রোগের হাত থেকে রেহাই পায়।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে বিজ্ঞানীরা তো হতবাক্! তাঁরা ভাবলেন, কাণ্ডটা কি? বিচিত্র এই উদ্ভিদটির মধ্যে এমন কি রয়েছে, যার এত গুণ? এ নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন সোভিয়েত আকাডেমিসিয়ান জি. ইয়েলিযাকভ্। যথেষ্ট সতর্কতা নিয়ে তিনি তৈরি করলেন গিনসেং-এর নির্যাস। আর সেই নির্যাস থেকে পৃথক করলেন কম করেও দশ রকম রাসায়নিক যৌগ। যৌগগুলির কোন্‌টি শরীরকে রোগমুক্ত অথবা সুস্থ সবল রাখতে সাহায্য করে শেষ পর্যন্ত তাও আবিষ্কার করলেন তিনি। বলতে কি এরপর থেকে সারা সোভিয়েত দেশে কি হুলস্থুলই না শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে গিন-সেংএর চাষ।

হ্যাঁ, সেও এক মজার কাণ্ড। গোড়ায় এই চাষের ব্যাপারটা সহজভাবেই ধরে নিয়েছিলেন কেউ কেউ। তাঁরা ভাবলেন, এ আর এমন কি শক্ত কাজ? চীন এবং দক্ষিণ এশিয়ার বনজঙ্গল থেকে গিনসেনং-এর চারা নিয়ে এসে যুৎসই জমিতে বসিয়ে দিলেই তো হয়। তারপর কিছুটা সার দাও, দরকার হলে সেচের ব্যবস্থা কর। ব্যস!

উঁহু! অত সহজ? নতুন গাছ বসাতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা জমি তৈরি করেন, আর সেই জমিতে পুঁতে দেন গিনসেং-এর চারা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই পোঁতাই সার। গাছ আর বাঁচে না।

কেউ কেউ বললেন, আরে বাপু, এ হলো গিয়ে প্রকৃতির দান। এমন ওষুধের গাছ ফলানো কি মানুষের পক্ষে সম্ভব?

হাল ছাড়লেন না সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। চললো দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে অনুসন্ধান। তাঁরা আবিষ্কার করলেন, এই উদ্ভিদটির জন্যে চাই নির্জন পরিবেশ। সেখানে সূর্যের আলো সরাসরি পড়বে না। অর্থাৎ জায়গাটি হবে ছায়াঘন। ঝড়ো বাতাস এই গাছের পরম শত্রু। অতএব

দেখা দরকার, এ গাছ যেখানে বসানো হবে সেখানে যেন ঝড়ো বাতাস না বয়। গাছে যাতে কোনভাবে এতটুকু আঘাত না লাগে সেটাও দেখা দরকার।

এই সব বিবেচনা করে ব্লাডিভোস্টক থেকে প্রায় দু'শ কিলোমিটার উত্তরে শিখেস্ট-আলিনের পার্বত্য অঞ্চলে শুরু হলো গিনসেং-এর চাষ। এখন সেখানে চীন এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সেই আজব গাছের ছড়াছড়ি। চারপাশে ছড়ানো পাহাড়। সেই পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছপালা। আর তাদের ছায়ায় গিনসেং-এর ছড়াছড়ি এখন। ঝড়ো হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে তাদের মাথার উপর তৈরি করা হয়েছে কাঠের ছাদ। ছাদ থাকায় সরাসরি সূর্যের আলোও তাদের গায়ে পড়তে পারে না। চাষীরা সব সময় চোখ রাখেন। এতটুকু আঘাত যেন তাদের গায়ে না লাগে। চাষ শুরু করার পর কম করেও বছর পাঁচ অপেক্ষা করতে হয় তাঁদের। অবশেষে এলো ফসল সংগ্রহের পালা।

চাষ করতে গিয়ে কতকগুলো ঘটনাও চোখে পড়লো চাষীদের। তাঁরা দেখলেন, চারা বসানোর পর এই উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে অত্যন্ত ধীরগতিতে। শেকড়ের গুণ অনেক বেশি। কিন্তু সেই শেকড়ের বাড়বাড়ন্তের কথা ভাবলে মাথা খারাপ হওয়ার মত অবস্থা। এক বছরে যতটা শেকড় বাড়ে তার ওজন শুকনো অবস্থায় মাত্র এক গ্রামের মতো হয়। 1971 সালে প্রাইমরিয়ে অঞ্চলে একটি গিনসেং গাছের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। ওই গাছটির শেকড়ের ওজন 320 গ্রাম। ওই ওজনে বিজ্ঞানীদের মনে হয়েছে গাছটির বয়েস কম করেও দু'শ বছর। গাছটি লম্বায় ছিল এক মিটারের মতো। আর সচরাচর একটি গিনসেং গাছে যেখানে শেকড় থেকে একটিমাত্র কাণ্ড বের হতে দেখা যায়, ওই গাছটির বেলায় কিন্তু তেমনটি দেখা যায় নি। প্রাচীন এই গাছটির ছিল পাঁচটি কাণ্ড। গাছটি অক্ষত অবস্থায় মাটি থেকে উপড়ে তুলতে সময় লেগেছিল তিন ঘণ্টার মত। গত পঁচিশ বছরে এত বড় গিনসেং গাছ আর কখনো পাওয়া যায় নি। গাছটির শেকড় বিক্রি হয়েছিল 11880 টাকায়। রাশিয়ার চাষের জমিতে এত বড় গিনসেং গাছ ফলানো সম্ভব হয় নি।

রুশ চাষীরা এখন বছরে 1000 কিলোগ্রাম গিনসেং সংগ্রহ করছেন। এর মধ্যে শেকড়ের পরিমাণ 340 গ্রাম।

চাষের উন্নতির জন্যে আরো একটি কায়দাও কাজে লাগাচ্ছেন রুশ-চাষীরা। গাছের বয়েস তিন বছর হলেই তার কুঁড়িগুলি ছিঁড়ে ফেলা হয়। এর ফলে ফুল ফোটানোর জন্যে গাছগুলির যতটা শক্তি খরচ করার কথা সেই শক্তির সাহায্যে গাছগুলি নিজেদের বৃদ্ধি বাড়ায়। এতে করে প্রাকৃতিক পরিবেশে গিনসেং যতটা বাড়ে তার চেয়ে বেশি বাড়ে চাষীদের জমিতে। বেশি শেকড় যাতে পাওয়া যায় সেদিকেই তাঁদের নজর বেশি। কারণ শেকড়েই গুণ সবচেয়ে বেশি।

গিনসেং-এর কথা ভাবলে তোমাদের কি মনে হয় না, উদ্ভিদ আমাদের কত বড় বন্ধু?

তোমাদের প্রিয় লেখক সমরজিৎ কর গত 18 জুন শুভেচ্ছা সফরে পশ্চিম জার্মানীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। জার্মানীর পর শ্রীকর কিছুদিন ইংলণ্ডেও সফর করবেন। সুতরাং এর পরের সংখ্যা-গুলিতে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় 'দপ্তর থেকে'র বদলে তোমরা হয়তো পেতে পারো 'জার্মানী থেকে' বা 'ইংল্যাণ্ড থেকে।'

জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ-14

তারকমোহন দাস

প্রায় 85 বছর আগের লেখা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাঁর ঋজু, সংস্কারমুক্ত মন ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধগ্রন্থের এক জায়গায় তিনি লিখছেন —'কোন একটা ঘটনার খবর পাইলে সেই খবরটা প্রকৃত কিনা এবং ঘটনাটা প্রকৃত কিনা, তাহা জানিবার অধিকার বিজ্ঞানবিদের প্রচুর পরিমাণে আছে। এই অনুসন্ধানকার্যই বোধ করি তাঁহার প্রধান কার্য।'

বিনা পরীক্ষায়, বিনা প্রমাণে শুধুমাত্র লোকের কথায় অথবা প্রচলিত কোন বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞানীরা কিছু মেনে নেন না, প্রত্যেক সিদ্ধান্তের পেছনে যুক্তি খোঁজেন, বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা চান—এটাই হলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিজ্ঞানীরা অনেক সময়ই পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত এমন কি নিজেদেরও পূর্ব সিদ্ধান্ত ভুল বলে প্রতিপন্ন করে থাকেন। এটাই বিজ্ঞানের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম দিক, যার ফলে ভুল তথ্যগুলি একদিন না একদিন ধরা পড়েই, সেগুলি সংশোধিত হয় এবং প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকটি চমৎকার উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

তোমরা জান সালোকসংশ্লেষের সংজ্ঞা হলোঃ উদ্ভিদ তার পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল সংগ্রহ করে সবুজ কণা ও সৌরশক্তির সাহায্যে শর্করা জাতীয় জৈব পদার্থ গ্লুকোজ তৈরী করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। বারংবার ভুল সংশোধন করে এই তিন লাইনের সংজ্ঞাটি লিখতে সময় লেগেছিল দুশো বছরেরও ওপর।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বেলজিয়ান জীবতত্ত্ববিদ ভ্যান হেলমণ্ট একটি পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি একটি বড় টবে ওজন করে 90 কেজি সার মাটি নিয়ে তাতে 2·25 কেজি ওজনের একটি ছোট উইলো গাছ রোপন করেছিলেন। প্রতিদিন গাছে তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণ জল দিতেন এবং লক্ষ্য রাখতেন গাছটি ধীরে ধীরে কেমন বড় হয়ে উঠছে।

ঠিক পাঁচ বছর পরে তিনি গাছটি মাটি থেকে তুলে ওজন করে দেখেন গাছটির ওজন বেড়েছে 71·55 কেজি। টবের মধ্যে যে মাটি ছিল তিনি সাবধানে বার করে ওজন নিলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন মাটির ওজন কমেছে মাত্র 57 গ্রাম। অর্থাৎ বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে উইলো গাছটি তার বৃদ্ধির জন্য 57 গ্রাম মাটি ব্যয় করেছে, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে গাছের ওজন বেড়েছে 71·55 কেজি। কিন্তু এই 71·55 কেজি জৈব পদার্থ গাছ কোথা থেকে এবং কিভাবে সংগ্রহ করল? নিশ্চয়ই মাটি থেকে নয়। সেই সময় বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে উদ্ভিদ যে জৈব পদার্থ তৈরী করে এটা আদৌ জানা ছিল না। ভ্যান হেলমণ্ট উইলো গাছটিতে নিয়মিত জল ছাড়া আর কিছু দেন নি। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, উদ্ভিদ জল থেকেই জৈব পদার্থ তৈরী করে এবং উদ্ভিদ মাটি থেকে জল ছাড়া আর কিছু নেয় না। টব থেকে যে 57 গ্রাম মাটি কমে গিয়েছিল তার ওপর তিনি কোন গুরুত্বই দিলেন না। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর এই সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। কিন্তু এই পরীক্ষার ফলাফল বহু বিজ্ঞানীকে ভাবিয়ে তুললো। 1727 খ্রীষ্টাব্দে ষ্টিফেন হ্যালিস নামে এক বিজ্ঞানী ভ্যান হেলমণ্টের ঐ সিদ্ধান্তের ওপর সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং গাছের ওজন বৃদ্ধিতে সূর্যের আলো ও গাছের পাতার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে একথা প্রথম উল্লেখ করেন।

এই বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন দিকে মোড় নেয় সুবিখ্যাত ইংরাজ রসায়নবিদ যোশেফ প্রিস্টলের একটি সরল পরীক্ষা থেকে। 1772 খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিখছেন—'মোমবাতি জ্বলার সময় বাতাস দূষিত হয়, কিন্তু সেই দূষিত বাতাসকে পরিশুদ্ধ করবার একটা চমৎকার ব্যবস্থা প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে, উদ্ভিদই এই কাজটা করে—হঠাৎ এই তথ্যটি আবিষ্কার করে আমার অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে। এরকম একটা ধারণা থাকা খুবই স্বাভাবিক—যেহেতু উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই বাতাসের প্রয়োজন, তাই উভয়েই একই পদ্ধতিতে বাতাসকে দূষিত করে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমারও এইরকম একটা ধারণা ছিল, যখন একটা ছোট মিণ্ট গাছকে একটা জলের পাত্রের মধ্যে রেখে তার ওপর একটা কাচের জার দিয়ে ঢেকে রেখে-ছিলাম। কিন্তু গাছটি যখন এইভাবে মাসের পর মাস ধরে বেঁচে রইল তখন আমি দেখলাম জারের ঐ বাতাস না পারল একটা জ্বলন্ত মোমবাতি নেভাতে, না পারল একটা জীবন্ত ইঁদুরের কোন রকম অসুবিধা সৃষ্টি করতে।'

প্রিস্টলেই প্রথম আবিষ্কার করেন গাছ থেকে মুক্ত অক্সিজেন নিসৃত হয়। কিন্তু তাতে গাছের কি সুবিধা হয় সেটা তখন বোঝা গেল না।

1779 খ্রীষ্টাব্দে একজন ডাচ্ বিজ্ঞানী ইঙ্গেনহাউস উদ্ভিদের এই অক্সিজেন তৈরীতে সূর্যালোকের প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করেন। তিনি প্রিস্টলের কাজের অসম্পূর্ণতার সমালোচনা করে বলেন এই বিক্রিয়ায় উদ্ভিদ যে একক ভূমিকা নিয়ে থাকে সেটা কিন্তু সত্য নয়, কেননা উদ্ভিদের ওপর সূর্যের আলোর ক্রিয়ার ফলেই এটা সংঘটিত হয়। সূর্যালোকের পরিমাণ যত বাড়ে, এই বিক্রিয়াও তত দ্রুত ঘটতে থাকে, অপরাহ্নে ক্রমশঃ তা কমে আসে, রাত্রের অন্ধকারে একেবারেই তা বন্ধ হয়ে যায়। 1782 সালে সুইস বিজ্ঞানী সেনেবিয়ার এই প্রক্রিয়ায় বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করেন। অবশেষে আর একজন সুইস্ বিজ্ঞানী নিকোলাস দ্য সমার 1804 সালে পরিষ্কারভাবে দেখান, এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে, মাটি থেকে জল গ্রহণ করে এবং বাতাসে অক্সিজেন পরিত্যাগ করে এবং এই বিক্রিয়ায় সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়।

1837 সালে ডুট্রোচেত নামে এক বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন, এই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় গাছের সবুজকণা বা ক্লোরোফিল অপরিহার্য। 1845 সালে লিবিগ্ বলেন উদ্ভিদদেহে এই কার্বন থেকেই সকল জৈব বস্তু তৈরী হয়। তার ফলে উদ্ভিদের ওজন বাড়ে। 1842 সালে স্যাক্স প্রমাণ করেন, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শ্বেতসার উৎপন্ন হয়। অবশেষে 1845 সালে মেয়ার সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার যে সংজ্ঞা দেন পরে তা সকলের স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল নামক দুইটি অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ শ্বেতসার তৈরী করে এবং জৈব খাদ্যের মধ্যে সৌর শক্তি রাসায়নিক শক্তিরূপে সংরক্ষিত করে রাখে যা উদ্ভিদের পরিপোষণে সহায়তা করে।

এই সালোকসংশ্লেষেরই প্রকৃত স্বরূপ, তার যাবতীয় তথ্য বিজ্ঞানীরা আজও উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হন নি। উদ্ভিদ তার একটি সূক্ষ্ম কোষের অভ্যন্তরে 'ক্লোরোপ্লাস্ট' নামক অঙ্গের মধ্যে যেভাবে এই বিক্রিয়াটি ঘটায় আমরা বিরাট ল্যাবরেটারীর মধ্যে আজও তা ঘটাতে সমর্থ হই নি। আমরা যেদিন উদ্ভিদের মতো বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল থেকে চিনি তৈরী করতে পারব সেদিন থেকে উদ্ভিদের সাহায্য না নিয়েই আমরা আমাদের ক্ষুধা দূর করতে পারব।

উদ্ভিদের এই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটির তাৎপর্য তাই অতি গভীর। প্রথমত পরিবেশের অজৈব পদার্থ জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে যে জৈব পদার্থ তৈরী হয় সেটি থেকে উদ্ভিদ যাবতীয় জৈব পদার্থ তৈরী করে। তার মধ্যে সৌর শক্তি কিছুটা বাঁধা পড়ে যায়, ঐ সব জৈব পদার্থ খাদ্যরূপে ব্যবহার করে পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী শক্তি সংগ্রহ করে, জীবন ধারণ করে। দ্বিতীয়ত সালোকসংশ্লেষের সময় বাতাসে যে অক্সিজেন যোগ হয় এবং বাতাস থেকে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষিত হয় তা উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বসনের সময় বাতাসে ঐ দুটি উপাদানের যে পরিবর্তন ঘটে তা সংশোধিত করে অর্থাৎ বাতাসে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের শতকরা ভাগ একটি স্থির বিন্দুতে রাখতে সাহায্য করে।

আরেকটি পরীক্ষার কথা বলছি। স্থানীয় কোন পুকুর থেকে এক ঘটি জল নিয়ে এস, ঐ ঘটির মধ্যে জল 48 ঘণ্টা ধরে স্থিরভাবে রেখে দাও, অধিকাংশ ময়লা যখন তলায় থিতিয়ে পড়বে তখন চারটি বড় টেস্টটিউব (বা চারটি ছোট কাঁচের বোতল) ঐ জলে পূর্ণ কর। 1নং টেস্টটিউবের মধ্যে দুটি ব্যাঙাচি রাখ। 2নং টেস্টটিউবের মধ্যে টাটকা জলজ উদ্ভিদ হাইড্রিলার পাঁচ সেণ্টিমিটারের মতো লম্বা একটি অগ্রভাগ রাখ। 3নং টেস্টটিউবের মধ্যে দুটি ব্যাঙাচি ও পাঁচ সেণ্টিমিটার লম্বা হাইড্রিলার অংশ রাখ। 4নং টেস্টটিউবেও ঠিক 3নং টেস্টটিউবের মত 2টি ব্যাঙাচি একটি পাঁচ সেণ্টিমিটার লম্বা হাইড্রিলা রাখ। এইবার টেস্টটিউবের মুখগুলি কর্ক ও প্লাস্টিক কাগজ দিয়ে ভাল করে বন্ধ করে দাও, যাতে বাইরে থেকে কোন বাতাস ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। 1, 2, ও 3নং টেস্ট-টিউব আলোতে পাশাপাশি রেখে দাও ঘরের মধ্যে, জানালা দিয়ে যে সূর্যের আলো আসে তাতেই হবে। 4নং টেস্টটিউবটি একটি কাগজের বাক্সের মধ্যে অথবা কাল কাগজে জড়িয়ে অন্য টেস্টটিউবগুলির পাশেই রেখে দাও। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় টেস্টটিউবগুলির মধ্যে ব্যাঙাচি ও হাইড্রিলার অবস্থা লক্ষ্য কর। 4নং টেস্ট-টিউবটি প্রতিদিন একবার আলোতে বার করতেই হবে। একটি সেণ্টিমিটার স্কেল টেস্টটিউবের পাশে ধরে ঐ ব্যাঙাচি ও হাইড্রিলা কোন টেস্টটিউবের মধ্যে কতটা বাড়ল তার মাপ নাও এবং খাতায় লিখে রাখ। শেষ পর্যন্ত কোন টেস্টটিউবের ব্যাঙাচির কি হলো, কতদিন বাঁচল তা লেখ। এই পরীক্ষার ফলাফল কি হবে, বা কি হওয়া উচিত তা এখনই বলা ঠিক হবে না। তোমরা নিজেরাই পরীক্ষাটি করে দেখ এবং এই পরীক্ষার ফলাফল থেকে একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত কর। বাস্তবে যা চোখে দেখছ তাই লেখ এবং যদি কোথাও পরীক্ষায় ত্রুটি ঘটেছে বলে মনে হয় তাও সিদ্ধান্তের সময় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা কর।

বিজ্ঞান কলেজ, 35 বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলি-19

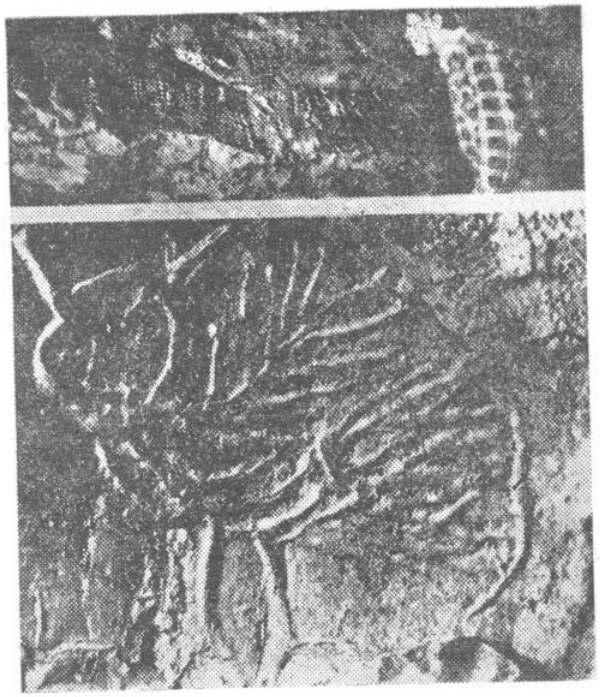

কলম্বাসের তিনশো বছর আগে

অমিতাভ সেন

এক নজর দেখে মনে হয় বুঝি অত্যন্ত আধুনিক শিল্পীর আঁকা ছবি। কোনো বাহুল্য নেই, সামান্য কয়েকটি রেখার মধ্যে ছন্দ ও গতি ধরা পড়েছে। কিংবা মানুষ ও জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু লাল বা বেগুনি রঙে আঁকা বাইসন বা বিশালাকার হাতি দেখেই 'অবাস্তব' আধুনিক শিল্প বলে মনে করা ভুল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রশিল্পের যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে স্পেনে, আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, এমন কি ভারতবর্ষেও - সেখানে তথাকথিত 'আধুনিক' আখ্যা দেওয়া ছবির সমস্ত গুণাবলীই দেখতে পাওয়া গেছে। 'অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট' বা 'বিমূর্ত' ছবি বিংশ শতাব্দীর অবদান নয়। বিশ তিরিশ হাজার বছর আগেকার বিমূর্ত শিল্পকলার নিদর্শন খুঁজে বার করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা।

সম্প্রতি আমেরিকার প্রত্নতাত্ত্বিকরা খুঁজে পেয়েছেন এমনি কিছু প্রাগৈতিহাসিক ছবি। ছবিগুলো সম্ভবত কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের প্রায় তিন শতাব্দী আগেকার। এঁকেছিলেন আমেরিকার আদি বাসিন্দা আমেরিকান -ইণ্ডিয়ানরা। টেনেসি প্রদেশের একটি গুহার কাদা-লেপা দেওয়ালের ওপর এই ছবিগুলি রয়েছে। মুদ্রিত ফটোগ্রাফের ওপরেরটিতে দেখা যাচ্ছে, টেনেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও অনুসন্ধানকারী দলের প্রধান ডক্টর চার্লস ফক্‌নার গুহার গায়ে এমনি এক সারি ছবি বা চিত্রলেখা (glyph) পরীক্ষা করছেন।

তলার ছবিটি একটি অতিকায় শিং-ওলা পেঁচার। এই পাখিটিকে আঁকার সময় হয় আঙুল, নয় তো কাঠি দিয়ে আঁচড় টানা হয়েছিল। গুহার মধ্যে বা আশেপাশে কোন ধনসম্পদ বা মানুষের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাই মনে হচ্ছে গুহাটি বোধ হয় শিল্প-চর্চা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কাজেই শুধু ব্যবহার করা হত।

টেনেসির ঠিক কোন্ অঞ্চলে গুহাটির অবস্থান তা এখনো জানানো হয় নি। আমেরিকার বিখ্যাত পত্রিকা ন্যাশানাল জিওগ্রাফিকের উদ্যোগে বর্তমানে এই গুহার ছবিগুলির ফটোগ্রাফ তোলার ও তার বিশ্লেষণের কাজ চলছে। এই কাজ শেষ হবার পর তাঁরা ঘোষণা করবেন গুহাটির অবস্থান।

হাজার হাজার বছর আগেকার মানুষের কত শিল্প-নিদর্শন যে আজও আমাদের অজানা কে বলতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রকৃতির বিস্ময়কর হস্তক্ষেপেই গুহা-চিত্রগুলি টিঁকে আছে আজো। গুহার মধ্যে সূর্যের প্রত্যক্ষ আলো, বৃষ্টি ও অপেক্ষাকৃতভাবে কম জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির জন্যেই ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যায় নি।

8/1A শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-73

বিজ্ঞান-সবাংদ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

গত 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলকাতা ও বাইরের বিভিন্ন সংস্থা নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

শিক্ষা সংসদ, যোধপুর পার্ক

যাদবপুরের রোটারী ক্লাব, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের ভারতীয় সংস্থা ও শিক্ষা সংসদের যৌথ উদ্যোগ এবং বিড়লা শিল্প ও কারিগরী প্রদর্শশালা ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সহযোগিতায় 5 জুন সারাদিন-ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে বিড়লা প্রদর্শশালায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের আবাসন মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী, সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং পোস্টার-ফটোগ্রাফ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী। দ্বিপ্রহরে ও অপরাহ্নে দুটি আলোচনা সভা হয়। আলোচনার সূচনা করেন রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় এবং অংশ গ্রহণ করেন স্বামী যুক্তানন্দ, সর্বশ্রী বি বি ভোরা, কৃষ্ণকামিনী রোহাংগী মুখার্জি, করুণা দেবী, দিলীপকুমার, সিংহ, শংকর চক্রবর্তী, সমর বাগচী, অরবিন্দ বিশ্বাস, দীপক দাঁ প্রমুখ।

জীবন বিজ্ঞান কেন্দ্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

6 জুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজে ভারতীয় জীববিজ্ঞান সংস্থার উদ্যোগে এবং মানুষ ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের সহযোগিতায় সারাদিন ব্যাপী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের বন সংরক্ষণ বিভাগের প্রধান শ্রীপ্রবীরকুমার রায়, প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভাপতি শ্রীএ কে সেন এবং সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার। আলোচনায় মূল বক্তব্য রাখেন ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের ছিলেন ডঃ এ কে সাহা, ডঃ বি ডি নাগ-চৌধুরী, ডঃ এ কে চৌধুরী, ডঃ বি কে বাচওয়াৎ, ডঃ এস কে জৈন, ডঃ বি আর রায়, ডঃ আর সেন, ডঃ তারকমোহন দাস, শ্রীকে সি শিবরামকৃষ্ণ প্রমুখ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত প্রদর্শনী পর্যবেক্ষণ করছেন শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় (ডান দিকে)

দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল

5 জুন থেকে 11 জুন পর্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী 'পরিবেশ চেতনা উদ্যোগ পর্ব-এর আয়োজন করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এই সংস্থা ছাত্র ও যুবকদের জন্যে এক দিনের একটি কোর্স সংগঠন করেন। পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এতে যোগদান করেন। পরিবেশ কিভাবে দূষিত হচ্ছে সে সম্পর্কে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। এছাড়া সালখিয়া, তমলুক, মুর্শিদাবাদ, টালিগঞ্জ, যাদবপুর ও বেহালায় বিভিন্ন দিনে পরিবেশ সম্পর্কে জনসভার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ মন্ত্রী শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী ও অধ্যাপক পি সোম। এই উপলক্ষে একটি ভ্রাম্যমাণ পোস্টার প্রদর্শনীরও আয়োজিত হয়।

জগদীশ বসু জাতীয় বিজ্ঞান মেধাবৃত্তি

গত 11 জুন কলকাতা যাদুঘরের আশুতোষ শতবার্ষিকী হলে 22তম জগদীশ বসু জাতীয় বিজ্ঞান মেধা বৃত্তি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী শীলা কল। এবছর মোট 11 জন বৃত্তি লাভ করে—অরুণাভ দাস, চন্দন গুহ, অভিজিৎ সেনগুপ্ত, অমিতাভ লাহিড়ী, দেবাশীষ বিশ্বাস, সন্দীপ ঘোষাল, শর্বরী গুপ্ত, অশোক মুখোপাধ্যায়, শুভঙ্কর রায়, রাকেশকুমার দুবে ও দেবব্রত পাইন। এই উপলক্ষে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীও আয়োজিত হয়। প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ প্রকল্পের স্বীকৃতি লাভ করে মহীতোষ সেন এবং শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসাবে জগদীশ বসু ফলক পায় সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল।

আগে যা ঘটেছে

রহস্যময়ভাবে মফস্বল শহরের একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল। যে ব্যাঙ্কে সদ্য ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে এসেছে সুশান্ত। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে, ব্যাঙ্কের তালা না ভেঙে স্ট্রংরুম থেকে ডাকাতি হয়ে গেলবহু টাকা। স্ট্রংরুমের তালা খুলতে হলে তো দুটো চাবির প্রয়োজন হয়—যার একটা থাকে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে, আর একটা সুশান্তর নিজের কাছে। তা হ'লে ডাকাতেরা তালা খুলল কি করে? একটু পরেই এল পুলিশ। সকলের জবানবন্দী নেওয়া হল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও একজন ডিরেক্টর এলেন। ব্যাঙ্কের সব কর্মচারীই দোষ চাপাল সুশান্তর উপরে। সুশান্ত ভীষণ ভেঙে পড়ল। অবশেষে তার বাবার বন্ধু সতীনাথ বাবুকে কলকাতায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল। সতীনাথ বাবু—ডিটেক্‌টিভই শুধু নন, বড় বৈজ্ঞানিক। ব্যাঙ্ক সুশান্তকে সাসপেণ্ড করল। এর মধ্যেই কলকাতা থেকে এলেন নতুন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ কে. সি. ত্রিবেদী।

সতীনাথবাবু হঠাৎই এসে সুশান্তকে যে জিনিস দেখালেন, তাতে সুশান্তর চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। স্ট্রংরুমের আলমারীতে যে ছাপ পাওয়া গেছে, তা মানুষের হাতের ছাপ নয়—বানর জাতীয় কোন প্রাণীর।

সতীনাথ বাবু পুলিশের বড়কর্তার কাছে এসে তাঁকে ছোট একটা জিনিসের ফিঙ্গার প্রিণ্ট করে দিতে বললেন। ফিঙ্গার প্রিণ্টটা কিছুটা নতুন খবর এনে দিয়েছে। কলকাতা থেকে সতীনাথ বাবু ফিরলেন পুলিশের এস পি এবং ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর মিঃ সেনকে সঙ্গে নিয়ে। সুশান্ত ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না। এস পি জানালেন সত্যিকার অপরাধীরা ধরা পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত স্বীকারও করেছে। তিনজন অপরাধীর মধ্যে একজন ব্যাঙ্কের কেশিয়ার, দ্বিতীয় থানার ছোটকর্তা, আর তৃতীয় নতুন ম্যানেজার মিঃ ত্রিবেদী।

॥ সতেরো ॥

সুশান্ত সতীনাথবাবুর কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। অনেকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

হতভম্ব ভাবটা কাটল যখন সতীনাথবাবু আবার কথাটা তুললেন।

"তিনজন আসামী, যাঁদের ধরা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—এক নম্বর ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার বৈজুনাথবাবু; দু'নম্বর এখানকার থানারই ছোট কর্তা, আর তিন নম্বর ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজার মিঃ ত্রিবেদী। কেমন না? ঠিক বলছি তো?"

সুশান্ত একটু ম্লান হাসি হেসে ঘাড় নেড়ে সায় ছিল।

"প্রথম দু'জনকে চিনতে এবং জানতে কোন গোলমাল হবার কথা নয়। সমস্যা হচ্ছে তৃতীয় ব্যক্তিটিকে নিয়ে—ব্যাঙ্কে যিনি তোমার জায়গায় ম্যানেজার হয়ে বসেছেন। কোন্ দেশী লোক তিনি? নাম শুনে বাঙালী না অবাঙালী বোঝা কঠিন। চোস্ত হিন্দী বলেন, আবার চোস্ত বাংলাও বলেন আবার সেই সঙ্গে চোস্ত ইংরেজিও বলে যান। ওঁর ইংরেজি শুনে বিদেশে যে অনেক দিন কাটিয়েছেন তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু ওঁর বাংলা?

"যাঁরা দীর্ঘ দিন কলকাতায় কাটিয়েছেন—বিশেষ করে ছাত্রজীবনে, তাঁরা অবাঙ্গালী হলেও এমন চমৎকার বাংলা বলতে পারেন যে মাতৃভাষায় সামান্য টানটুকুও তার মধ্যে থাকে না। আমি এমন অনেক কলেজের ছাত্র দেখেছি যে আসলে শিখ হলেও খাঁটি বাংলা বলে বাঙ্গালীদেরই উচ্চারণে। দাড়ি আর পাগড়ি না থাকলে কে বলবে লোকটা শিখ? এ সম্পর্কে আমার এক বন্ধুর অভিজ্ঞতার গল্প বলি শোন। বন্ধুটি ছিলেন কলেজের অধ্যাপক আর সে কলেজটা কলকাতায় হলেও ঠিক বাঙালীদের কলেজ নয়—ভারতের সর্বদেশের সর্বপ্রান্তের ছাত্রছাত্রীরা সেখানে পড়তে আসে। পড়াবার ভাষাটা তাই সর্বদাই ইংরেজি। তবে ক্লাসের বাইরে অনেকেই বাংলায় কথা বলে থাকে।

"একদিন তিনি ক্লাস নিয়ে বেরিয়ে আসতেই করিডোরে একটি অবাঙালী ছাত্র এগিয়ে এসে বেশ সপ্রতিভভাবে বাংলায় জিজ্ঞাসা করল, স্যার, আপনাদের নাম কি? আমার অধ্যাপক বন্ধুটি হেসে নিজের নাম ব'লে তার পর বললেন, 'আমি খুব খুশি হয়েছি তুমি বাংলায় কথা বলতে শিখেছ দেখে। কিন্তু আর একটু শিখতে হবে। আমি তো প্লুরাল্ নাম্বার নই, তাই আপনাদের নাম না বলে বলবে আপনার নাম কি। কেমন?"

"ঐ ছাত্রটির পাশে আর একটি ছাত্র, ওরই বন্ধু, সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'স্যার ও তো বাঙালী নয়, তাই একটু ভুলভাল

করে ফেলেছে।' অধ্যাপক বন্ধু বললেন, 'বেশ তো, তোমরা, বাঙালী ছাত্রেরা, ওকে একটু শিখিয়ে দিও।'

ছেলেটি বলল, 'তা দেব। তবে আমিও কিন্তু, স্যার, বাঙ্গালী নই - আমার বাড়ি কেরালা।'

শুনে তো অধ্যাপক থ।

সুশান্ত বলল, "হ্যাঁ, এরকম অবাঙালীকে নিখুঁত বাংলা বলতে আমিও শুনেছি।"

"শুনবেই। কলকাতায় অনেক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকেও বাঙালীর মত চমৎকার নিখুঁত বাংলা বলতে শুনেছি। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের সেই গল্পটা জান তো?"

"কোন্ গল্প?"

"সেই যে এক মহাপণ্ডিত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় এসে হাজির হয়েছিলেন। সব ভাষায় তিনি সমান দক্ষ। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া। যখন বাংলায় কথা বলেন, কারও বুঝবার সাধ্য নেই তাঁর মাতৃভাষা বাংলা নয়। যখন হিন্দীতে কথা বলেন, তখন মনে হয় তিনি কোন খাঁটি হিন্দীভাষী দেশের লোক।

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মহাফাঁপরে পড়লেন। লোকটি কোথাকার তা জানতেই হবে। তখন গোপাল ভাঁড়কে ডেকে ভার দিলেন রহস্য উদ্ধার করতে। গোপাল ভাঁড় রাজী হলেন।

"তার পরদিন সন্ধ্যার পর ঐ পণ্ডিত যে বাড়ির দোতলায় থাকতেন তারই সিঁড়ির মাঝখানে গিয়ে গোপাল ভাঁড় দাঁড়িয়ে রইলেন, পণ্ডিত যখন নিচে নামবেন তার আগের মুহূর্তে। তারপর পণ্ডিত যখন নামছেন তখন গোপাল ভাঁড় ফুঁ দিয়ে দিলেন সিঁড়ির আলোটা দিলেন নিভিয়ে। পণ্ডিতও অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে পড়বি তো পড় একেবারে গোপাল ভাঁড়ের ঘাড়ে! সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "সঁড়া অন্ধা?"

"গোপাল ভাঁড় ততক্ষণে রহস্য উদ্ধার করে ফেললেন। তখুনই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে গিয়ে বললেন, মহারাজ এ পণ্ডিত উড়িষ্যা দেশের লোক।'

"মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করে বুঝলে?' গোপাল উত্তর দিলেন, 'মানুষ অন্য সময় যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন, বিপদে পড়লে বা উত্তেজনার সময় তার মুখ দিয়ে মাতৃভাষা ছাড়া আর কিছুই বেরুবে না। এক্ষেত্রেও আমি পণ্ডিতকে নিয়ে সেই পরীক্ষাই করেছিলাম। দেখলাম, রাগের মাথায়উ ত্তেজনার মুহূর্তে তার মুখ দিয়ে যে ভাষা বেরুল তা ওড়িয়া ভাষা। কাজেই বুঝতে বাকি রইল না পণ্ডিত উড়িষ্যা দেশের লোক।"

সুশান্ত এবার হো হো করে হেসে উঠল।

সতীনাথবাবু বললেন, "মিঃ ত্রিবেদী সম্বন্ধেও ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটল। কথাবার্তায় চালচলনে বিলিতী ভাব থাকলেও তিনি যে বাঙালী এ কথাটা সর্বদাই জাহির করতে চাইতেন। সেদিন নদীর ধারে যখন তাঁর সঙ্গে আচমকা দেখা হলো তখন তাঁর পরনে খাঁটি বাঙালী পোশাক। কোঁচানো ধুতি বাঙালীরা যেভাবে পরে ঠিক সেইভাবে পরা। গায়ে ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী, হাতে একটা ছড়ি। তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না কথায় কথায় ইংরেজি বললেও, হিন্দী শব্দ তিনি খুব কমই ব্যবহার করেন বেশির ভাগই বলেন বাংলা। বলেনও ভালো। কিন্তু ঐ যে বললাম, গোপাল ভাঁড়ের ফরমুলা। রাস্তায় আচমকা ঝোপের থেকে একটা সাপ বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে পড়তেই তিনি ভয়ে আঁৎকে উঠলেন আঃ, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ দিয়ে যে শব্দটি বেরুল, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে,— তা সাঁপ, সাপ নয়। বাঙালীরা কখনও সাপকে সাঁপ বলে না, বলে হিন্দীভাষীরা। তাই তখনই বুঝে ফেললাম উনি বাঙালী নন, কিন্তু বাঙালী বলে পরিচয় দেবার ভান করে আসছেন।

সুশান্ত বলল, "সত্যিই তো, আমায় তো অতটা খেয়াল হয় নি! কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি?

"খুব সহজ উদ্দেশ্য। আত্মগোপন করা। তখনই মনে হ'ল এই ত্রিবেদী সাহেবকে একটু ভালো করে বাজিয়ে দেখতে হবে। তাই কারণে অকারণে তাঁর অফিসে কয়েকবার হানা দেওয়া গেল এবং সেই ফাঁকে তাঁর কথাবার্তার ওপর সতর্ক কান রাখতেও ভুললাম না। দেখলাম, ত্রিবেদী বেশ ভালো ইংরেজি উচ্চারণ করেন এবং সেটা আমেরিকা ঘেঁষা ইংরেজি, অর্থাৎ তিনি যে বেশ কিছু দিন সে দেশে কাটিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। ইংরেজি ছাড়া আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় ফাঁকে ফাঁকে তিনি বাংলাও যথেষ্ট বলেন, কিন্তু পারতপক্ষে হিন্দী বলতে চান না, যদিও এ শহরটা একটা হিন্দী ভাষী শহর।

"লক্ষ্য রাখলাম ওঁর উচ্চারণের দিকে। আমার সন্দেহ সত্যি সত্যি ঠিক বলে আবার প্রমাণিত হ'ল। মাঝে মাঝে বাংলার মধ্যে দু'একটা হিন্দী শব্দ অজান্তে ওঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। যেমন সত্যি না বলে একবার বলে ফেললেন সাচ্ কথা। কোন বাঙ্গালী ওরকম বলে না।

"কিন্তু বাঙালী সাজবার উদ্দেশ্য কি? লোককে ভাঁওতা দেওয়া ছাড়া আর কি? কিন্তু কোন সৎ লোক তো ওরকম করে না। নিশ্চয়ই কোন বদ্ মতলব আছে ওঁর কিংবা এমন কোন কাণ্ড করেছেন যার জন্য নিজেকে লুকোনো দরকার। তোমার বন্ধু সরযূপ্রসাদ সম্পর্কেও মাঝে

মাঝে নানা কৌতূহল দেখা গেল ওঁর মধ্যে। কিন্তু স্পষ্ট বললেন, সরযূপ্রসাদকে উনি চেনেন না, তবে তাঁর কথা শুনেছেন।

"ব্যাপারটা নিয়ে একটু খোঁজখবর করা দরকার মনে হ'ল। সামান্য একটু মেক্‌ আপ করে নিয়ে আমি সাময়িক ভাবে নানারকম ছদ্মবেশ ধরতে পারি এ তো তুমি জানই। সেইরকম বিভিন্ন ছদ্মবেশে কয়েকবার ওঁর অজান্তে ওঁর গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। এরই মধ্যে আবিষ্কার করলাম সরযূপ্রসাদের খালি বাড়িতে ওঁর যাতায়াত আছে এবং সরযূপ্রসাদের সেই ভৃত্যটির সঙ্গেও জানাচেনা আছে মনে হ'ল। খুবই আশ্চর্য মনে হ'ল। সরযূপ্রসাদকে চেনেন না অথচ তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়ি যাতায়াত করেন এ কিরকম ব্যাপার! সরযূপ্রসাদ যে এখনও ফেরে নি —বাইরেই, এবং হয়তো ভারতের বাইরেই কোথাও গেছে এমন একটা ধারণা এখানকার সকলেরই ছিল এবং আমারও তাই বিশ্বাস ছিল।

"অনেক ভেবেচিন্তে শেষে ঠিক করলাম এখানকার থানার বড় কর্তার সঙ্গে একটু আলাপপরিচয় করে দেখা যাক তিনি কোন হদিশ দিতে পারেন কিনা। ভদ্রলোক কবিতা লেখেন, যা পুলিশের চাকরির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। তাই ঠাট্টা করে তাঁকে ভোঁদা বলেছিলাম তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। কিন্তু সেটা একটা রসিকতা মাত্র। ছোটকর্তার চাইতে যে বড় কর্তা অনেক—অনেক চৌকস লোক তা আমি সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম। তাঁর কাছে কবিতা শুনবার নাম করেই যেতাম বটে, কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে অনেক জরুরি কথাবার্তাও হ'ত যা তোমাকে বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। ছোট কর্তা লোকটি নিজেকে সর্বদা কাজ-পাগল দেখালেও লোকটি যে আসল ব্যাপারে বড়কর্তার ধারেকাছেও যেতে পারেন না তাও দু'দিনেই বুঝে ফেললাম। তবে তিনি যে ব্যাঙ্ক ডাকাতির একজন সাকরেদ তা ধরা পড়ল অনেক পরে।"

সতীনাথবাবু একটানা বলে চলেছিলেন, এবার একটু থামলেন। সুশান্ত বাধা দিয়ে বলল, "থামলেন কেন, সবটা না শুনে যে স্বস্তি পাচ্ছি না।"

সতীনাথবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "বলব। বলব বলেই তো শুরু করেছি।

"তোমার বন্ধু সরযূপ্রসাদের সঙ্গে মিঃ ত্রিবেদীর যে একটা ঘনিষ্ঠ আঁতাত আছে বা ছিল সেটা বুঝতে বেশি দেরী হ'ল না। আর দু'জনের চালচলনে এমন একটা অদ্ভুত মিল আছে মনে হ'ল যা সাধারণতঃ যমজ ভাইদের মধ্যে ছাড়া দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে একটু পড়াশোনা করার দরকার হল, তাই চলে এলাম কলকাতায়।

"সরযূপ্রসাদকে চোখে না দেখলেও তার একটা ফটোগ্রাফ দেখার সুযোগ হয়েছিল। তোমাদের ক্লাবে একটা গ্রুপ্‌ ফটো ছিল, তার মধ্যে সরযূপ্রসাদও ছিল। থানার বড়কর্তাকে বলে তার একটা কপি করিয়ে নিতে বিশেষ কষ্ট হ'ল না। তাঁরই কোন বিশ্বস্ত লোক ক্লাবে গিয়ে কোন সুযোগ বুঝে ঐ ফটো থেকে আর একটা ফটো তুলে এনেছিল খুব দামী ক্যামেরার সাহায্যে। তারপর এই নতুন ফটো থেকে সরযূপ্রসাদকে বেছে নিয়ে সেটাকে এন্‌লার্জ করে ফেলা এমন কিছু কঠিন নয়। ব্যস্‌, জ্যান্ত সরযূপ্রসাদ ধরা না দিলেও ছবিতে সে স্পষ্ট ধরা দিল। সেই ছবির সঙ্গে মিঃ ত্রিবেদীর চেহারা মিলিয়ে দেখি — মুখ আলাদা হলেও দু'জনের দেহের গড়নে খুবই মিল রয়েছে। একই রকম চওড়া কাঁধ, চওড়া বুক, এমন কি হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত দু'জনেরই এক ধরনের—লম্বা, টানা টানা, ওরিয়েণ্টাল ছবিতে যেমন দেখা যায়।

"হঠাৎ মাথায় কেমন একটা সন্দেহ জাগল। ছুটলাম ডাক্তার মুখার্জির কাছে কলকাতায়। ডাক্তার মুখার্জির নাম নিশ্চয়ই জান?"

"কোন্‌ মুখার্জি? সার্জারিতে যাঁর খুব নাম?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। শুধু সার্জারি নয়, বিশেষ করে প্লাস্টিক সার্জারি। এই প্লাস্টিক সার্জারির এখন প্রচুর উন্নতি হয়েছে। এর সাহায্যে কাটা ঠোঁট জুড়ে দেওয়া যায়, থ্যাবড়া নাক টিকোলো করে দেওয়া যায়, এমন কি আগুনে পুড়ে মুখের কোন জায়গা কুঁচকে মুখখানা বীভৎস হয়ে গেলে সেটাকেও আবার টান টান করে মুখের একটা ছিরি ফিরিয়ে আনা যায়। শুধু মুখ কেন, শরীরের যে কোনও জায়গায় এই প্লাস্টিক সার্জারি চালানো যেতে পারে।"

"কিন্তু তাতে কি আর তার চেহারা আগের মত থাকবে?"—সুশান্ত প্রশ্ন করল।

"মোটেই না, মোটেই না। আমার এক আত্মীয়ের গালে ক্যান্‌সার হয়েছিল। ডাক্তার মুখার্জি তার সমস্ত গাল আর তার আশপাশের অঙ্গ কেটেকুটে বেমালুম উড়িয়ে দিলেন। তারপর তারই শরীরের আর এক জায়গা থেকে সজীব চামড়া তুলে এনে গ্রাফ্‌টিং করে কাটা মুখটা ভরাট করে দিলেন। দু'তিন মাস পরেই দেখি লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে যে সেই আগের লোক কার সাধ্য চেহারা দেখে তা বুঝতে পারে?"

"সত্যি, ও-রকম হয় নাকি?"

"হয় বৈকি। আমার যে নিজের চোখে দেখা। তোমাদের সরযূপ্রসাদ সম্বন্ধেও আমার ঐরকম একটা

সন্দেহ হ'ল। তার ফটো দেখেছিলাম ঠিকই, কিন্তু তাতে তো জলজ্যান্ত মানুষটাকে সব সময় ধরা যায় না। সকলের কাছেই শুনেছিলাম তার সারা গাল পুড়ে এমন একটা লাল জড়ুল ছিল যা একদিক্‌কার গালটাকে সর্বদা লাল টক্‌টকে করে রেখেছিল। সে জড়ুল দেখে হাজার লোকের মধ্যেও তাকে মুহূর্তে চিনে ফেলা যেত।"

সুশান্ত ঘাড় নেড়ে জানাল, কথাটা ঠিক।

"কাজেই বুঝতে পারছ, সরযূপ্রসাদ জানত যে কোন রকমে যদি তার গাল জোড়া জড়ুলটা অস্ত্রোপচার করে অর্থাৎ সার্জারির সাহায্যে উপড়ে ফেলে তার জায়গায় তারই গায়ের অন্য কোন জায়গা থেকে চামড়া নিয়ে মুখের অন্য দিক্‌টার সঙ্গে রঙ মিলিয়ে গ্রাফ্‌টিং করে বসিয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে তার মুখের চেহারা আমূল বদলে যাবে। অর্থাৎ সরযূপ্রসাদ হয়েও সে আর সরযূপ্রসাদ থাকবে না।

"এবার ওর সম্বন্ধে একটু গবেষণা করা যাক, কেমন?

"অবস্থা ওর ভালো নিশ্চয়ই, নইলে আমেরিকা যাবার সুযোগ পেত না। আমেরিকায় শুধু যাওয়া নয়, সেখানকার নানা জায়গায় ঘুরবার সুযোগও পেয়েছিল। ওখানে গেলে যেমন অনেক ভালো ভালো জিনিস আত্মস্থ করা যায়, ঠিক তেমনি ইচ্ছে করলে এমন অনেক কিছুও শেখা যায় যা মানুষের জঘন্য মনোবৃত্তিকে উস্‌কে দিতে পারে। আমেরিকা পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে অনেক সৎ ও গুণি-জন, দিয়েছে অদ্ভুত মাথাওয়ালা এমন সব বিজ্ঞানী যাঁরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর চেহারাটা পালটে দিয়েছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে উপহার দিয়েছে প্রচুর ভদ্রবেশী চোর, ডাকাত এবং গুণ্ডাও। এরাও অনেকে বেশ শিক্ষিত এবং চালচলনের রীতিমত ভদ্র। কিন্তু সেগুলো হচ্ছে ওদের মুখোশ। ভিতরে খুঁজলে দেখবে এক-একটি মূর্তিমান শয়তান লুকিয়ে রয়েছে তার মধ্যে। তোমার বন্ধু সরযূ-প্রসাদ ওখানে গিয়ে সম্ভবতঃ এই ধরনের লোকদের দলে গিয়েই মিশেছিল, এবং মুখে ভদ্রতা, সৌজন্য ইত্যাদির মুখোস এঁটে ভিতরে ভিতরে কি করে কাজ হাসিল করতে হয় সেটাও শিখে গিয়েছিল সন্দেহ নেই। কারণ এসব গুণপনায় ওদের জুড়ি মেলা ভার।

"কিন্তু চিরকাল তো সবাই বাইরে বাইরে কাটাতে পারে না। দেশের ওপর একটা মায়া অনেকেরই থাকে, ওরও হয়তো ছিল। আবার এও হতে পারে যে এখানকার সরল প্রকৃতির মানুষদের ঠকানো অনেক সহজ বুঝে সে এখানেই তার কর্মস্থল বেছে নিয়েছিল। শুনেছি সে ঠিক এ শহরের লোক নয়, কিন্তু এখানেই বেশির ভাগ সময় থাকত—একা একা একটা চাকর নিয়ে, এবং সচ্ছলভাবেই।

বলব, বলব বলেই তো শুরু করেছি

"তার মাতৃভাষা হিন্দী। কিন্তু কয়েক বছর কলকাতার কলেজে পড়াশোনা করায় বাঙালী বন্ধুদের সঙ্গে মিশে সে বাংলা কথাটাও বেশ ভালোই বলতে শিখেছিল—যদিও দু' একটা হিন্দুস্থানী টান এড়ানো বড় সহজ নয়।"

সুশান্ত হঠাৎ বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু কাকা এত লোক থাকতে হঠাৎ সরযূপ্রসাদের কথাই বা আপনার মনে এলো কেন? আপনি তো তাকে চিনতেনও না, কখনও চোখে দেখেনও নি। সে ছাড়াও তো এখানে কত লোক আছে। কই, তাদের কারো কথা তো আপনার মনে আসে নি।"

সতীনাথ বাবু ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলেন, কথাটা ঠিক। তারপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসি আবার ফুটে উঠল তাঁর মুখে। বললেন, "বলব, বলব। সবই খুলে বলব বলেই তো বসেছি তোমার সঙ্গে।" (ক্রমশঃ)

16 টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-25

ঘুমন্ত হাঙ্গর

তৃপ্তি রায়

সুদূর গাল্‌ফ অফ মেকসিকোর একটি অপূর্ব বেলাভূমি। প্রবাল দ্বীপ রচনা করেছে এক সুন্দর 'লাগুন'—জল যেখানে তরঙ্গহীন, স্বচ্ছ। নিচে তার নানারকম রঙীন সামুদ্রিক প্রাণী রচনা করেছে আর এক নন্দনকানন। লাগুনের বাইরে প্রবালের দেওয়াল মাথা কুটে মরছে অশান্ত আটলান্টিক মহাসাগরে, কিন্তু ছোট একটি গেট ছাড়া প্রবেশের উপায় নেই।

কিছুদিন আগেকার কথা, এক স্বামী-স্ত্রী এসেছেন ছুটি কাটাতে এই স্বর্গরাজ্যে। কিছুদিন থাকবেন, মহানন্দে সাঁতার কাটবেন ও করবেন স্কুবা ডাইভিং। স্কুবা হলো একপ্রকার মুখোশ যেটা মুখে এঁটে জলে ডুব দিলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত হয় না। হঠাৎ একদিন তাঁরা আক্রান্ত হলেন সমুদ্রের সবচেয়ে বিভীষিকাময় সন্তান টাইগার শার্ক দ্বারা। কী জানি কেমন করে সে ওই গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছিল এক মা ডলফিন ও তার বাচ্চাকে ধাওয়া করে। তাঁরা অবশ্য রক্ষা পেয়েছিলেন, তবে সে এক আশ্চর্য ঘটনা। ওই মা ডলফিনই রক্ষা করেছিল তাঁদের।

কিন্তু এই বেলাভূমির কিছু দূরেই রয়েছে পৃথিবীর আশ্চর্যতম জায়গা যেখানে সবচেয়ে হিংস্রতম হাঙ্গরও হয়ে যায় অহিংস। নির্ভয়ে যাওয়া যায় তার কাছে। খুবই বিরক্ত করলে বড় জোর ল্যাজের একটা ঝাপটা দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে সরে যায়। বিশ্বাস করা যায় না, তাই না? কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা সত্যি। গাল্‌ফ অফ মেক্‌সিকোর অন্তর্গত য়ুকাটান পেনিনসুলা, যেখানে একবার এক লবস্টার ডুবুরি লবস্টারের সন্ধানে ডুব দেয়। লবস্টার হলো গলদা চিংড়ি। ডুব দিতে দিতে সে দেখতে পায় এক চমৎকার ল্যাবিরিনং। গুহা-সমাবেশ বা গোলকধাঁধা। গুহার মধ্যে অপেক্ষা করছিল এক বিরাট বিস্ময়! একটি স্ত্রী রিকোয়েম শার্ক। প্রথমটা সে ভীষণ ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু দেখে শার্কটি তাকে দেখেও আক্রমণ করল না, উপরন্তু যেরকম স্থির হয়ে ছিল সেইরকমই থাকল। তবে কি শার্কটি মরা? আফ্রিকায় যেমন হাতীদের কবর আবিষ্কার হয়েছিল আকস্মিকভাবে, ও কি শার্কের কবর আবিষ্কার করল? কিন্তু না তো। হাঙ্গরটি তো দিব্যি জ্যান্ত। চোখ খোলা। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসও নিচ্ছে। সাধারণত শার্করা অবিশ্রান্ত সাঁতার কেটে চলে মুখ খোলা রেখে, যাতে শ্বাসকার্য চালাবার জন্যে শক্তি ব্যয় করতে না হয়। কিন্তু তখন অন্য সব মাছের মতোই শ্বাসকার্য চলছে।

পৃথিবীর বহু সমুদ্রবিজ্ঞানী ছুটে এলেন এ রহস্যের সমাধান করতে। তাঁরা নিজেরাও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁরা এই গুহার মধ্যে বিশ্রামরত মানুষখেকো জক হাঙ্গরের এত কাছে যেতে পারলেন। হাঙ্গরটির নাকের উপরে ছোট্ট ছোট্ট ফুটো 'এ্যামকুলি অফ লরেনজিনি' পর্যন্ত দেখা সম্ভব হলো। এই এ্যামপুলির দ্বারা শার্ক জলের সামান্যতম বৈদ্যুতিক স্রোতের তফাৎ বুঝতে পারে। অন্য কোনো প্রাণীর বা গাছের উপস্থিতি এইভাবেই নিমেষের মধ্যে জানতে পারে। বিজ্ঞানীদের দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না সেই শার্কটি। তাঁরাও এমন কি খোলা মুখের মধ্যেও দাঁতের সারি গুনতে সমর্থ হলেন।

কিন্তু কেন এই বিচিত্র ব্যবহার? নানা গবেষণার পরে বিজ্ঞানীরা নানারকম কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। দেখা গেছে, গুহার তলা থেকে মিষ্টি জলের ধারা নির্গত হচ্ছে এবং সমুদ্রের লোনা জলের সঙ্গে মিশছে। গুহার মধ্যের জলেও তাই লবণত্ব কম ও অম্লত্ব বেশি এবং জলের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণও বেশি। যেহেতু জলের লবণত্ব কম, এই জলে মাছেদের গায়ের প্যারাসাইটগুলি বেশির ভাগ খসে যায়।

বাকি সব থাকে অনুরক্ত 'রিসোরা' মাছ—একেবারে খেয়ে দেয়ে পরিষ্কার করে দেয় শার্কদের। তবে কি এটা 'স্নানঘরের' সমতুল্য? শার্করা পরিষ্কার হবার জন্যে মাঝে-মাঝেই আসে। জলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশি, অম্ল ভাগও বেশি। তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে এক বিশেষ বৈদ্যুতিক স্রোত, যার উৎপত্তি মিষ্টি জল ও নোনা জলের মিশ্রণে। এই তিনটি জিনিসের এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয় হাঙ্গরের উপর। তারা গাঁজা বা মদ খাওয়ার মতন একটু 'হাই' অবস্থায় পৌঁছে যায়।

কাজেই এই প্রকৃতির বিশ্রামাগারে হাঙ্গরের আগমন হয় প্রথমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে ও দ্বিতীয়ত একটু আরাম করে 'হাই' অবস্থা উপভোগ করতে। যতক্ষণ বাবু নেশার ঘোরে আরাম করেন ততক্ষণ প্রভুভক্ত ভৃত দাঁত, মুখগহ্বর, ফুলকা, মাথা, চোখের আশপাশ ঘুরে ঘুরে ভালো করে পোকামাকড় বেছে মালিশ করে দেয়। আঃ কী আরাম!

বিজ্ঞানীদের ধারণা এরকম আরো অনেক বিশ্রামাগার আছে সমুদ্রের তলায় এবং হাঙ্গরেরা নিয়মিতভাবে সেখানে যায় বিশ্রাম নিতে। হয়তো আরো অনেক তথ্য এখনো অজানা রয়ে গেছে, তবুও এ জানার তাৎপর্য কম নয়। বিজ্ঞানীরা তো কত অসম্ভবই সম্ভব করেছেন। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে হিংস্র হাঙ্গর হবে অহিংস আর সমুদ্র হবে অন্তত একটি বিপদ থেকে মুক্ত। সেই সুদিনের কামনা করা যাক।

P 17 আশুতোষ চৌধুরী লেন, কলি-19

ধনেশ পাখিদের কথা

অজয় হোম

প্রিয়াত্মজ বংশ

নীলকণ্ঠ বর্গের অন্তর্গত প্রিয়াত্মজ বংশের পাখিদের পক্ষিজগতের সঙ বা ভাঁড় বললে অত্যুক্তি হবে না। চেহারাটার মধ্যেই কেমন যেন একটা হাস্যকর ভাব। দেহের অনুপাতে চঞ্চু বিশাল এবং মাথার চাঁদির প্রায় উপর থেকে ঠিক চঞ্চুর উপরে মাঝামাঝি পর্যন্ত এসেছে এক শিরস্ত্রাণ। এই বংশের কিছু প্রজাতির শিরস্ত্রাণরূপ অতিরিক্ত চঞ্চুর ন্যায় বস্তুটি এত ছোট যে প্রায় না দেখা যাওয়ার মতো। কয়েকটির আবার চঞ্চুর মতোই প্রকাণ্ড।

প্রিয়াত্মজদের চঞ্চু বিশালাকার হলেও তার ভার অতি সামান্য। যতটা পুরু তার সবটাই মৌচাকের মতো খোপ-কাটা এবং ভিতর ও বাইরের আবরণ কাগজের মতো পাতলা হলেও বেশ শক্ত। নেত্রলোম বা পক্ষ্ম খুব বড়ো এবং কালো। তলার দিকের ডানার আচ্ছাদক পালক ওড়ার পালকগুলিকে পুরো না ঢাকার জন্যে ওড়ার সময় পাখার খুব শব্দ হয়। গায়ে তিনটি আঙুল সামনে, পিছনে একটি। অনেক প্রজাতির সামনের তিনটি আঙুলের মধ্যে দু'টি খুব কাছাকাছি। এজন্যে এদের যুক্তাঙ্গুল গোষ্ঠীর (সিনড্যাকটাইলাস) মধ্যে ধরা হয়।

ডিম ফুটে ছানা যখন বার হয় তখন গায়ে একবিন্দুও পালক থাকে না। পরে পালক গজাতে শুরু করে। ছানাদের প্রথম পালকরাজির রূপ কিন্তু পুরুষের মতন, অন্যান্য পাখিদের যেমন স্ত্রী-পাখিদের মতন হয় তেমন নয়।

প্রিয়াত্মজ বংশে 6টি গণ—বাধ্রীনস (আনথ্রোকোসেরস), দীর্ঘবাল (টোক্কাস), বলিচঞ্চু (রাইটিসেরস), প্রিয়াত্মজ (বুসেরস), মাতৃনিন্দক (এসিরস) এবং পত্রকণ্ঠ (টিনোলিমাস)। পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় বাধ্রীনস, দীর্ঘবাল ও বলিচঞ্চু গণের প্রজাতিকে। ভারতে প্রিয়াত্মজ গণের পাখিই (গ্রেট পায়েড হর্নবিল) আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। লম্বায় 130 সেমি (52 ইঞ্চি)। এই রাজধনেশদের দেখা যায় পশ্চিমঘাট, মহীশূর, কেরালা, পশ্চিম মাদ্রাজ, নেপাল থেকে আসাম ও বাংলাদেশে সাড়ে 3 হাজার ফুটের ভিতর শাল ও চিরহরিৎ জঙ্গলে।

ধনেশ

সারারাত ট্রেনটা দৌড়েছে। মাঝেমাঝে থেমেছে আবার দৌড়েছে। ঘুম যখন ভাঙলো তখন দেখি জংশন শিলিগুড়ি। সবে ভোর হচ্ছে। একসময় শিলিগুড়িও ছাড়ল। গুলমা গুলামাখোলা পার হয়ে সেবকে এলাম। এখানে তিস্তা পার

ধনেশ

হতে হবে রেলপুলের উপর দিয়ে। অদূরেই দুই পাহাড়ের মাঝে তিস্তারই উপর পদাতিক ও যানবাহনের কংক্রিট সড়ক-পুল। ট্রেনের দরজা খুলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখছি। সকালবেলার আলোয় লাগছে বেশ। হঠাৎ একটা গাছের মাথা থেকে উড়ল সাদা কালো বিশাল চঞ্চু এক পাখি। ওকে অনুসরণ করে উড়ল আরও কয়েকটা ওই পাখি। উড়ে গিয়ে বসল কাছেই একটা গাছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে সকালের আলোয় প্রাকৃতিক পরিবেশে এই পাখিগুলিকে দেখে বড়োই ভালো লাগল।

পাখিগুলি নীলকণ্ঠ বর্গে প্রিয়াক্সজ বংশে বাধ্রীনস গণের (আলথ্রাকোসেরস) এক প্রজাতি ; নাম—ধনেশ, বাগমা ধনেশ (আনথ্রাকোসেরস মালবারিকাস)। হিন্দি—ধান চিড়ি, সুলেমানি মুরগী। ইংরেজি—ইণ্ডিয়ান পায়েড হর্নবিল।

ধনেশ লম্বায় 89 সেমি (35 ইঞ্চি), অর্থাৎ আকারে গোদা চিলের চেয়ে কিছু বড়ো। স্ত্রী-পুরুষ প্রায় একই দেখতে। আকারে স্ত্রী-পাখি কিছুটা ছোট। স্ত্রী-পুরুষের বুকের নিম্নাংশ থেকে পেট, তলপেট, লেজের মাঝের জোড়া বাদে, ডানার ধার ও ডগা সব সাদা ; বাকি পালক সবুজাভ কালো। পুরুষের কনীনিকা কমলা-লাল বা লাল, স্ত্রীর পাটকিলে অথবা নীলচে-পাটকিলে। চঞ্চু মোম-হলুদ ; চঞ্চুও শিরস্ত্রাণের গোড়া কালো এবং শিরস্ত্রাণের মাঝখানটাও কালো। স্ত্রী-পাখির চঞ্চু ও শিরস্ত্রাণে অতটা কালো নেই। চোখের চারপাশের চামড়া কালো বা নীলচে-কালো পুরুষের ; স্ত্রীর সাদা বা মাংসল-সদা। উভয়ের গলার কাছে পালকহীন চামড়া ফিকে গোলাপী বা মাংসল। পা ও আঙুল সীসে-ধূসর, সবুজাভ-ধূসর অথবা গাঢ় ধূসর।

বাসস্থান—ভারত থেকে পুবে ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া এবং দক্ষিণ চীন। ভারতে 2টি প্রজাতি। প্রথম (আ মালাবারিকাস)—উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং বাংলাদেশ ; তরাই ও সমতলের ধার ঘেঁষে হাজার ফুট উচ্চতার ভিতরে। দ্বিতীয় 'মালাবার পায়েড হর্নবিল' (আ কোরোনাটাস)—মধ্যভারত, বিহার (বিশেষত ছোটনাগপুরে) ; দক্ষিণে অন্ধ্র (গঞ্জাম), পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই থেকে কেরালায় 22 হাজার ফুটের ভিতর এবং শ্রীলঙ্কায়।

খাদ্য – প্রধানত ফলভোজী ; কিন্তু টিকটিকি—গিরগিটি নেংটি ইঁদুর এবং পাখির ছানাতেও আপত্তি নেই।

স্বভাব—ধনেশ প্রজননকাল ছাড়া অন্য সময়ে দলবদ্ধ হয়ে বড়ো এবং ছোট দু'রকমের গাছের ফল যেমন খায় তেমন মাটিতে নেমে শামুক কীটপতঙ্গ এবং ছোটখাটো সরীসৃপ ধরেও খায়। পক্ষিতত্ত্ববিদ চার্লস ইংগলিস মাছ ধরেও খেতে দেখেছেন। সুতরাং এক কথায় বলা যায় ধনেশ সর্বভুক। অনেককে আবার দেখা যায় কি ফল কি ফড়িং বা কি কোনও সরীসৃপ অর্থাৎ যে কোনো খাদ্যকে চঞ্চুতে ধরে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তারপর বিকট হাঁ করে সেটিকে গলাধঃকরণ করতে।

ধনেশের ওড়াটা কয়েকটা ডানার ঝাপট, পাখা ছড়িয়ে ডানার ডগা একটু তুলে ভেসে চলা, আবার ডানার ঝাপট। ওড়ার সময় ডানার ঝাপটে বেশি শব্দ হয়। মাটিতে হাঁটাটা সৌন্দর্যহীন। বদখৎ ক্যাবলামার্কা। খানিকটা লাফানো। তারপর অল্প হেলেদুলে দৌড়ানো, তারপর আবার লাফিয়ে চলা। ভয় পেলে বা তাড়া খেলে সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে সোজা উড়তে পারে।

ডাকটা অদ্ভুত। খানসামা বা বাবুর্চির হাতে জবাইয়ের আগে মুরগী আপত্তি জানিয়ে যে আর্তনাদ করে তার সঙ্গে কুকুরছানার ডাকের ও চিলের চেঁচানোর মিশ্রণ। দলবদ্ধ অবস্থায় সবসময়ে কিছু না কিছু আওয়াজ করে চলে। দলের একজন যদি কিছু কর্কশস্বরে বলে তখন বাকি সবাই এক-একজন করে নিজের মতামত ওই বিষয়ে ততোধিক কর্কশ-স্বরে প্রকাশ করে।

ধনেশ খুব সহজেই পোষ মানে। সবকিছু খেতে অভ্যস্ত বলে বাঁচানো মোটেই শক্ত নয়। বন্দীদশায় 25-30 এমন কি তারও বেশি বছর বাঁচে। 'বোম্বাই ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি'র প্রতীক'চিহ্ন ধনেশ এবং সংস্থার বাড়িটির নাম ও 'হর্নবিল হউস'। এই ধনেশটি ছিল সংস্থার পোষা-পাখি। 26 বছর বেঁচে ছিল। বর্তমানে বোম্বাইয়ের প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়াম-এ পাখির গ্যালারিতে মৃতদেহটিকে খড় পুরে রাখা আছে। নাম ছিল উইলিয়ম। উইলিয়ম টেনিসবল লুফতে শিখছিল। তার দিকে যত জোরেই বল ছোঁড়া হোক না কেন উইলিয়ম অবলীলাক্রমে সেই বল ধরতে পারত। একটাও ফসকাতো না। ভাব দেখাত এ আর এমন কি শক্ত ক্যাচ। সত্যি এত ভালো স্লিপ ফিল্ডার আর দেখি নি।

কলকাতার গড়ের মাঠে অকটরলোনি মনুমেন্ট অর্থাৎ শহীদ মিনারের ধারেকাছে, শিয়ালদা বা চিৎপুর-বড়বাজারের কাছাকাছি দেখা যায় জড়িবুটির ব্যাপারীদের। তাদের নানা জিনিসের মধ্যে থাকে ধনেশের চঞ্চু তেল নখ হাড় ইত্যাদি। কখনও কখনও পোষা ধনেশও তাদের কাছে থাকে। কিম্বদন্তী, ধনেশের তেল বাতের অব্যর্থ ওষুধ। এমনকি হাতের তালুতে কয়েক ফোঁটা ঢাললে চুঁইয়ে অপর দিকে বেরিয়ে আসে। ব্যক্তিগতভাবে আমি কিন্তু এ ঘটনা ঘটতে দেখি নি হাতের তালুতে তেল নিয়েও।

ধনেশের প্রজননকাল মার্চ থেকে জুন। স্ত্রী-ধনেশ কোনো বড়ো গাছের কাণ্ডে স্বাভাবিকভাবে কোনো গর্ত পেলে বাসা হিসাবে সেটাকেই বেছে নেয়। এইরকম গর্ত দেখা যায় বছরের পর বছর একই স্থানে বাসা বানিয়ে ডিম ফুটিয়ে ছানা তুলতে। সেই পুরোনো গর্তে বসে স্ত্রী-পাখি নিজের বিষ্ঠা ও পুরুষের আনা ভিজে মাটি মিশিয়ে এক প্লাস্টার তৈরি করে। নিজেকে ভেতরে রেখে চঞ্চুর চেপ্টা দিকটা কর্ণিকের মতো করে ওই প্লাস্টার দিয়ে গর্তের

মুখ বোজায়। কেবল একটা খুব ছোট ছাঁদা রেখে পুরুষের আনা খাদ্য সেই ফোকরের ভিতর দিয়ে গ্রহণ করার ও নিজের বিষ্ঠা বাহিরে ফেলে দেবার জন্যে। ওই প্লাস্টারের দেওয়াল সিমেন্টের মতো এমন শক্ত হয় যে অন্য কোনো অনিষ্টকারী জন্তুর পক্ষে তা ভেঙ্গে প্রবেশ করা অসম্ভব। দেওয়াল তৈরি করতে দুই থেকে তিন দিন সময় লাগে।

স্ত্রী-ধনেশ এইভাবে স্ব-ইচ্ছায় বন্দীজীবন বরণ করে নিয়ে ডিম পেড়ে তা দিতে থাকে। ডিম পাড়ে 2 থেকে 5 টি সাদা তার উপর কিছুটা ফিকে-পাটকিলের আভা। ডিমের মাপ—লম্বায় 1·96, চাওড়ায় 1·39 ইঞ্চি (49·9 × 34·9 মিমি)।

ছানাদের বড়ো হতে 15 থেকে 21-22 দিন লাগে। এই সময়ের মধ্যে পুরুষকে স্ত্রী এবং সন্তানদের ভরণপোষণ একা বহন করতে হয়। মুখে করে আনে 15-20 টা বটফল ফোকরের ফাঁক দিয়ে অল্প বের করা চঞ্চুতে ঢেলে দেয় সেই ফলগুলি। এ সময় পুরুষের নিষ্ঠা দেখবার মতো। কি অক্লান্ত পরিশ্রমটাই না করে।

ছানারা একটু বড়ো হলেই স্ত্রী-পাখি চঞ্চু দিয়ে হাতুড়ি ঠোকার মতো করে ভাঙতে থাকে প্লাস্টার করা দেওয়াল। ধৈর্য ধরে সেটা ভাঙতেও বেশ সময় লাগে। স্ত্রী-পাখি বেরিয়ে এসেই আবার দেওয়াল তুলে দেয় ফোকর রেখে। ওই গর্তের মধ্যে বাচ্চাদের বসে থাকতে হয় লেজটি সোজা

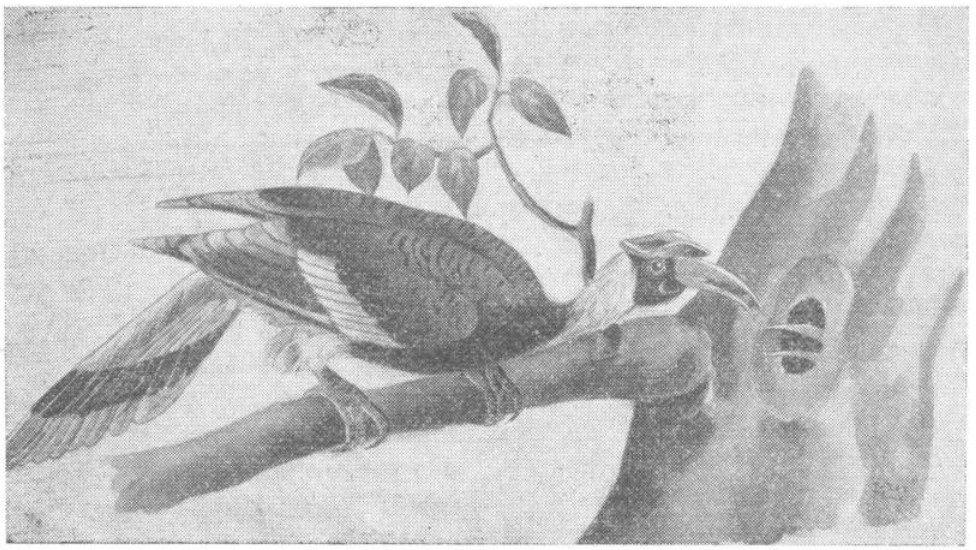

ধনেশ তার স্ত্রীর জন্যে খাবার এনেছে

ডিম থেকে ছানা ফুটতে 28 থেকে 40 দিন লাগে। ততদিন পুরুষ বট-পিপুলের ফল, টিক-টিকি গিরগিটি এবং যা কিছু খাদ্যবস্তু সবই এনে স্ত্রীকে সেই ফোকরের মধ্যে দিয়ে চালান দেয়। অতিরিক্ত খাটাখাটুনিতে পুরুষ বেশ হাড় জিরজিরে রোগা হয়ে পড়ে। ওদিকে স্ত্রীটি বড়োলোকের গিন্নীর মতো শুয়ে বসে খেয়ে দেয়ে দিনে দিনে মোটা হয়। মনে হয়, অনেক জাতের স্ত্রী ধনেশ এই সময় নির্মোচন বা কুরিচ (মোল্ট) খায় অর্থাৎ পুরাতন পালক পড়ে গিয়ে নতুন পালক গজায়। স্ত্রী-পাখির কুরিচ খাওয়া বা না-খাওয়া অবস্থাটা গবেষণাসাপেক্ষ।

খাড়া করে তুলে। এই সময় যদি কেউ দেওয়াল ভেঙ্গে ছানাদের বাইরে বের করে আনে তখন দেখা যাবে লেজটি তাদের খাড়া করা। বেশ কিছুক্ষণ সময় নেয় বৃহত্তর পৃথিবীর ছন্দের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে লেজটা নামাতে

গর্তের মধ্যে ছানাদের রেখে বাবা-মা দুজনকেই খাই-খাই সন্তানদের খাওয়া যুগিয়ে চলতে প্রাণপাত করতে হয়। কিছুদিন পর যখন বোঝে দুনিয়ার সঙ্গে সন্তানরা নিজেরাই বোঝাপড়া করার মতো শক্ত-সমর্থ হয়েছে তখন তাদের দেওয়াল ভেঙ্গে মুক্ত করে দেয়।

8/1 ডঃ বীরেশ গুহ স্ট্রীট. কলিকাতা-17

বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র / লেখা ও ছবি : দিলীপ দাস

লণ্ডন থেকে জগদীশচন্দ্র গেলেন প্যারিসে। ডাক পড়ল বার্লিনে, সেখানে অ্যাকাডেমি অব সায়ান্সের সভায় বক্তৃতা দিলেন

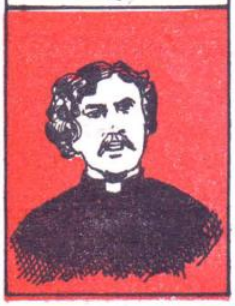

জগদীশচন্দ্র তখন খ্যাতির তুঙ্গে। এই সময় অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর বৈজ্ঞানিক মারকনিও একটি বিনা তারে বার্তা প্রেরণ পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা পেটেন্ট করে নিলেন। নাম দিলেন 'রেডিও'

ফলে প্রথম বিনা তারে বার্তা প্রেরণের আবিষ্কারক রূপে মারকনির নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে গেল

পাশ্চাত্যের বেশ কিছু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁরা ভারতে উপযুক্ত গবেষণাগারের প্রয়োজনীয়তা বুঝে সমবেত ভাবে তৎকালীন ভারত সচিবের নিকট আবেদন জানালেন।

চিঠি এসে উপস্থিত হল বড় লাট লর্ড এলগিন-এর হাতে। তিনি জগদীশচন্দ্রকে বললেন—

বেশ কিছুদিন পরে এই প্রস্তাবটি আবার যখন ঘুরে-ফিরে এলো

আমি জানতাম ওরা এরকমই একটা কিছু বলবে।

বহুদিন পরেও প্রস্তাবিত গবেষণাগারের কোন চিহ্ন না দেখে তাঁর এক বিদেশী বৈজ্ঞানিক বন্ধু সরকারের কাছে যেতে চাইলেন।

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

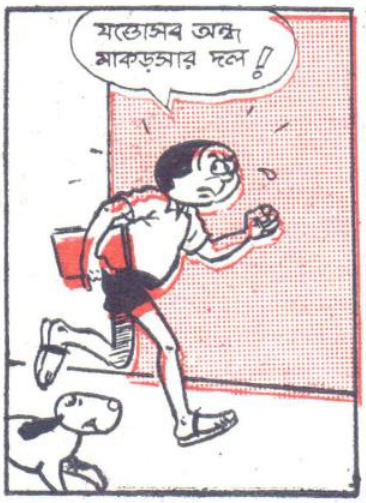

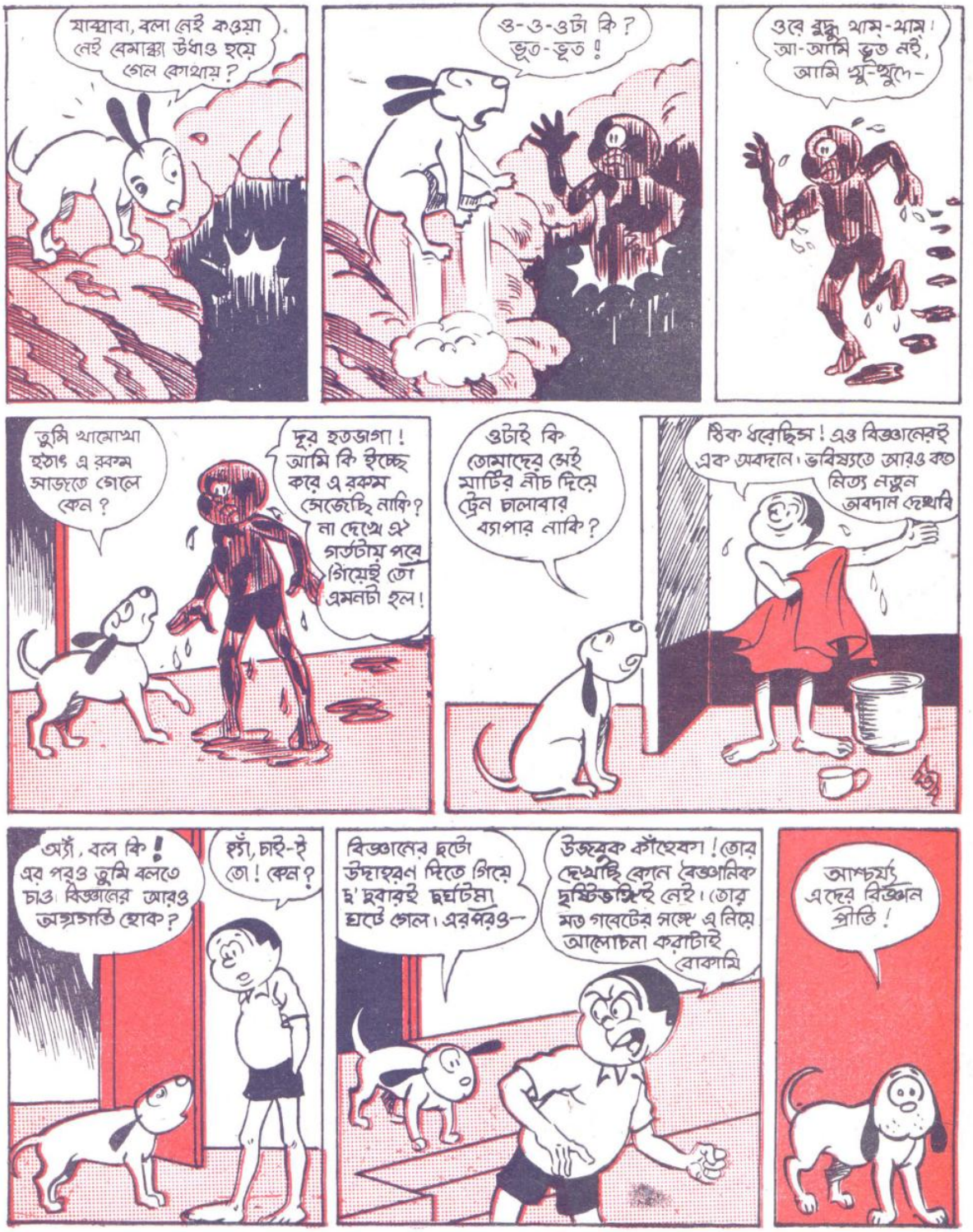
যাব্বাবা, বলা নেই কওয়া নেই বেমাক্কা উধাও হয়ে গেল কোথায়?
ও-ও-ওটা কি? ভূত-ভূত!
ওরে বুদ্ধু থাম্-থাম্! আ-আমি ভূত নই, আমি খু-খুদে-
তুমি খামোখা হঠাৎ এ রকম সাজতে গেলে কেন?
দূর হতভাগা! আমি কি ইচ্ছে করে এ রকম সেজেছি নাকি? না দেখে ঐ গর্তটায় পরে গিয়েই তো এমনটা হল!
ওটাই কি তোমাদের সেই মাটির নীচ দিয়ে ট্রেন চালাবার ব্যাপার নাকি?
ঠিক ধরেছিস! এও বিজ্ঞানেরই এক অবদান। ভবিষ্যতে আরও কত নিত্য নতুন অবদান দেখবি
অ্যাঁ, বল কি! এর পরও তুমি বলতে চাও বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতি হোক?
হ্যাঁ, চাই-ই তো! কেন?
বিজ্ঞানের দুটো উদাহরণ দিতে গিয়ে দু'দুবারই দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এরপরও—
উজবুক কাঁহেকা! তোর দেখছি কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই নেই। তোর মত গবেটের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করাটাই বোকামি
আশ্চর্য্য, এদের বিজ্ঞান প্রীতি!

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ

বরুণ মজুমদার

নামের নামাবলী

আমরা অনেক সময় বলি, নামে কি যায় আসে। গোলাপকে যে নামেই ডাকো না কেন সে সুন্দর। তার সৌন্দর্য মোটেই কমে না। কিন্তু নামে যায় আসে বই কি। তোমাদের কারো নাম যদি খেঁদা বোঁচা হয় তা হলে কি তা শুনতে ভাল লাগবে?

ওয়েলসের পেনার্থ নামে একটা শহরে মিস্টার ট্রেভর জর্জ নামে এক ভদ্রলোক খুব খেলা পাগল ছিলেন। পৃথিবীর নামকরা খেলোয়াড়দের নিয়ে তাঁর যত মাতামাতি। ইতিমধ্যে তাঁর এক কন্যা জন্মালো, তিনি সেই নবজাত কন্যার নামকরণ করলেন বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়দের নামাবলী জুড়ে জুড়ে! তাঁর মেয়ের বার্থ সার্টি ফিকেটে নাম রাখা হলো জেনিফার পেলে জাইরোজিনহো রিভেলিনো আলবার্টো সিজার ব্রেইটনার ক্রুইফ গ্রীভস্ চার্লটন বেস্ট মুর বল কিগান ব্যাংকস্ গ্রে ফ্রান্সিস ব্রুকিং কার্টিস তোষাকল জর্জ। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় নাম বোধ হয় এ পর্যন্ত কারো রাখা হয় নি। কি মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ অতবড় নাম যার রাখা হলো তার কি অবস্থা বোঝ তো। সত্যিই এটা একটা বিশ্ব রেকর্ড এবং গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল রেকর্ডে স্থান পাবার যোগ্য। অবশ্য মেয়ের মা এই বিরাট নামে আপত্তি জানিয়েছেন। বিরাট চটাচটির পর অবশ্য নামটা কাটা পড়েছে। তবে অনেকদিন ধরে নামটা ছিল। এখন ঐ মেয়েটার নাম কাটছাঁট করে শেষ পর্যন্ত রাখা হয়ে জেনিফার অ্যান জর্জ।

জাপানী রোবোট

আজকাল জাপানে প্রায় সব কাজে রোবোট ব্যবহারের খুব চল হয়েছে। মানুষের মতোই সহজে কাজ করে দেয় এই যান্ত্রিক রোবোট। একটি সংবাদে জানা গেল, গত বড়দিনের সময় জাপানের ওসাকায় একটি কেকের কারখানায় তৈরা কেকের ওপর ছবি-আঁকা ও লেখার জন্যে ২০টি রোবোট কাজে লাগানো হয়। এই রোবোটে মাত্র 20 সেকেণ্ডে একটি কেক তৈরী সম্পূর্ণ করতে পারে। জাপানে কল-কারখানাতেও রোবোট যন্ত্র-দানবের মতো কাজ করে চলেছে। মানুষ কোথাও চোখে পড়ে না। রোবোট একাই একশো।

ভারী মেসিনপত্র তোলা ও নামানো এবং মানুষের পক্ষে বহন করা শক্ত — এরকম অনেক যন্ত্রপাতির বোঝা বইতে পারে এই রোবোট। মেসিনপত্র ঝালাই-এর কাজেও এর কোন জুড়ি নেই। এতে যেমন সময় বাঁচে তেমনি দুর্ঘটনার ঝুঁকিও কম। যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের কাজ করতে গেলে অনেক দুঘটনার ঝুঁকি থাকে এবং কাজেও ক্লান্তি আসে। কিন্তু রোবোটের কোন ক্লান্তি নেই, কারণ সে যন্ত্র-মানব।

প্রবাল দ্বীপে সিন্ধুসভ্যতা

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ মিঃ থর হিয়ারডাল, ভারত মহা-সাগরে মালদীভস থেকে বেশ কিছু দূরের এক প্রবাল দ্বীপে চার হাজার বছরের পুরোনো সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন। এই অঞ্চলে খননকার্য চালিয়ে তিনি কিছু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও কুড়িটি বিশাল চুনাপাথরের মূর্তির সন্ধান পেয়েছেন। মিঃ হিয়ারডাল বলেছেন যে, এখানে প্রাপ্ত কিছু শিলালিপির সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার সম্পর্কযুক্ত কিছু লিপি, যা খৃষ্টজন্মের দু'হাজার বছর আগে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলে অনুমান করা হয়, তার বেশ মিল আছে।

নিজের মুখোমুখি

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না। তবু আজ ঘটলো। প্রফেসর দস্তিদার নিজের ভাঙা গলায় মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান গাইলেও, বসে বসে গান শুনছেন এমন ঘটনা প্রায় অসম্ভব। আজ সেই অসম্ভব দিন।

আজ সন্ধ্যে থেকেই প্রফেসর দস্তিদারের পড়তে, লিখতে কোন কিছুই ভাল লাগছিল না। তার মানে যে মন খারাপ তাও নয়। বরং মনটা বেশ খুশিই ছিল! হঠাৎই এটা-ওটা নাড়তে নাড়তে শচীন দেব বর্মনের রেকর্ডটা নজরে পড়লো।

মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। দুজনে যদিও ভিন্ন পথের পথিক, তবু খুব প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল দুজনের মধ্যে। শচীন এ রেকর্ডটা প্রেজেন্ট করেছিল দস্তিদারকে। বোধ হয় একবার শুনেছিলেন দস্তিদার ঠিক মনে নেই।

দস্তিদার স্টিরিওতে রেকর্ডটা চাপিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। পূর্ণিমার বোধ হয় দু'তিন দিন বাকি। চাঁদের আলোর বেশ জোর। শচীনের কথা আজ বড় বেশি মনে পড়ছে দস্তিদারের। বোম্বেতে একবার ও'র বাড়িতে দিন দুয়েকের জন্যে উঠেছিলেন দস্তিদার। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ দস্তিদারের নজর পড়লো। দেওয়ালে ঠাঙানো রাশিয়ান বিজ্ঞানী ভি ওরলভের ছবিটার দিকে।

দস্তিদার ছবিটার দিকে আরও ভাল করে তাকালেন। না, এত ভুল হতে পারে না। ওরলভের ছবিটা দেখলেই বোঝা যায় বেশ রাশভারী গোছের মানুষ। অসাধারণ গম্ভীর। কিন্তু ছবিটা পাল্টে গেল কি করে। এ তো দেখা যাচ্ছে ওরলভ হাসছে। বেশ খুশি খুশি মুখ চোখ। তবে কি দস্তিদার কিছু ভুল করেছেন।

দস্তিদার উঠে এসে দাঁড়ালেন ওরলভের ছবিটার সামনে। ভাল করে লক্ষ্য করলেন। না, কোথাও ভুল নেই। ওরলভ হাসছেন। ওরলভের চোখে মুখে এক অপূর্ব প্রশান্ত দীপ্তি। দস্তিদারের মতই যেন শচীনের গান শুনে ওরলভও আনন্দ পাচ্ছেন।

দস্তিদার ঘড়িতে সময়টা দেখলেন। রাত নটা পনের। আজ 18 জুলাই। রাত বাড়তে লাগলো। দস্তিদারের ঘুম আসছে না। গান বন্ধ করার পরে ওরলভের ছবি যেমন গম্ভীর তেমন গম্ভীর। কিন্তু মাঝখানের ওই আধ-ঘণ্টা সময়, ছবিটা কি আশ্চর্যভাবে পাল্টে গিয়েছিল।

রাতে বসেই দস্তিদার চিঠি লিখলেন, সময় ও তারিখের

কথা উল্লেখ করে। লিখলেন 'ওই সময়টা মিষ্টার ওরলভ আপনি কি করছিলেন, আপনার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল সব আমাকে জানান। আমার একটি গবেষণাগার কাজে প্রয়োজন।'

আরও চমক অপেক্ষা করছিল বোধ হয়। পরদিন সন্ধ্যেবেলায় দস্তিদারের ফোনে বেজে উঠল ওরলভের কণ্ঠস্বর। ওরলভও বললেন, মিষ্টার দস্তিদার ওই দিনের ওই সময় আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়। আমার নাতির বাঁচার কথা ছিল না, কিন্তু তখনই আমার মেয়ে আমাকে ফোনে জানাল, আমার নাতির বিপদ কেটে গেছে। জীবনে এত খুশি আমি আর কোনদিন হই নি। আমি আধঘণ্টা আমার মেয়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলাম।

ফোনটা নামিয়ে রেখে দস্তিদার কিছুক্ষণের জন্যে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তা হলে মানুষের মানসিক অবস্থা কি ছবির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রত্যেকের ফটোগ্রাফের সঙ্গে তাঁর কি আত্মিক সম্পর্ক থাকে!

দস্তিদার ডুবে গেলেন এই নতুন খেলায়। সংগ্রহ করতে সুরু করলেন চেনাজানা, বিখ্যাত ব্যক্তিদের ফটোগ্রাফ। সে সব ছবির সামনে কখনও গান বাজান, কখনও বিকট শব্দ করেন, কখনও কান্নার সুর বাজান, কখনও কাঁচ ভাঙার শব্দ তৈরি করেন। শ্রুতিমধুর আর শ্রুতি-সুখকর শব্দ সৃষ্টি করেন আর লক্ষ্য করেন ফটোগ্রাফগুলোর ভাবান্তর। কখনও কখনও বুঝতে পারেন ফটোগ্রাফের প্রতিক্রিয়া। কখনও কখনও ধরতে পারেন না সে প্রতিক্রিয়া।

সেইসব ব্যক্তিদের চিঠি লেখেন, সময় ও তারিখ উল্লেখ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবির প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ওই ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া মিলে যায়। দস্তিদার উপলব্ধি করেন, এক বিশেষ কোন শব্দতরঙ্গ কোন বিশেষ ব্যক্তির কোষস্পন্দনের আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তার ফলেই ওই ব্যক্তির মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয়।

উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়েকের চিঠি দস্তিদারকে ভীষণ অবাক করেছে। শ্রীপট্টনায়কের সঙ্গে দস্তিদারের পরিচয় বহুদিনের। দস্তিদার আর পট্টনায়ক এক কলেজে পড়েছিলেন। মনে আছে একবার পরীক্ষার আগের দিন রাতে দস্তিদার পট্টনায়ককে মুখে মুখে সমস্ত পড়া বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পট্টনায়ক দস্তিদারকে লিখেছেন, আপনার চিঠি পড়ে একই সঙ্গে দুঃখিত ও আনন্দিত হলাম। আপনি নিশ্চয়ই কোন নব গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন, এ কথা জেনে আমি আনন্দিত। আপনার পাসট্ রেকর্ডারের আবিষ্কার আমাদের দেশের গর্ব। কিন্তু আপনি যেদিন রাতের কথা লিখেছেন, সেদিন হঠাৎ আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। মনে হলো যেন আমার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কোন কারণ বলতে পারি না।

কিন্তু হঠাৎ-ই এক দুঃখের অনুভূতি আমাকে ভীষণ বিষণ্ণ করে তুললো। কেন এমন হলো আমি জানি না। তবে এর মধ্যে কোথাও মিথ্যে নেই।'

দস্তিদার চিঠিটা পেয়ে বিষণ্ণ হলেন। বন্ধুকে এভাবে দুঃখ দিতে তিনি চান নি। কিন্তু এ যেন এক নেশার মত। যত জানছেন, যত মিলে যাচ্ছে, তত নানাভাবে দস্তিদার আরও জড়িয়ে যাচ্ছেন। মানুষের নানা ধরনের প্রতিক্রিয়াকে চেষ্টা করছেন ফটোগ্রাফের মধ্যে ধরতে। তার ধারণা এই গবেষণা সার্থক হলে হয়তো তিনি মানুষের অবসাদ দূর করতে পারবেন। এমন কি হয়তো মানুষের দুঃখজনক ঘটনাকেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। অনেক না-দেখা, না-চেনা, দূরের মানুষকেও দস্তিদার পারবেন সুখী করতে, অনেক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে।

দস্তিদার এক প্রবন্ধে লিখলেন, 'আমি লক্ষ্য করে দেখেছি মৃত মানুষের ফটোগ্রাফের হলদে রঙের প্রাবল্য দেখা যায়। এমন কি অসুস্থ মানুষের ফটোগ্রাফেও হলদে রঙের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।' দস্তিদার এখন ছবি দেখেই বলে দিতে পারেন এ ছবি মৃত, না জীবিত মানুষের।

সেদিন বোধ হয় শনিবার। অনেকগুলো চিঠি পেয়েছেন দস্তিদার। সব চিঠিতেই দস্তিদারের খুশি হবার হবার কারণ রয়েছে। দস্তিদার যে ধরনের প্রতিক্রিয়ার আশা করেছিলেন উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তাই হয়েছে।

দস্তিদার মৃত একমাত্র ছেলে চন্দনের ছবিটা খুঁজে বের করলেন। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে, তীব্র আলোর তলায় ফেলে বার বার পরীক্ষা করলেন না কোথাও হলদে রঙের প্রাবল্য নেই। এমন কি হলদে রঙ প্রায় অস্পষ্ট।

দস্তিদার ভাবলেন এ নিশ্চয় তাঁর ভুল। এ তাঁর দুর্বলতা। চন্দনের এই অকাল মৃত্যুকে পিতা হিসাবে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। তিনি চন্দনকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন বলেই হয়তো ফটোগ্রাফের হলদে রঙ তার চোখে ধরা পড়ছে না।

দস্তিদার মনটাকে কঠোর করলেন। তিনি বিজ্ঞানী, ব্যক্তিগত আবেগকে তিনি প্রশ্রয় দিতে পারে না।

তিনি ক্যাসেটে কান্নার সুর বাজিয়ে দিলেন। করুণ কান্নার সুর। গভীর চাপা দুঃখের। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন চন্দনের সেই বার বছর বয়সের ফটোগ্রাফের দিকে। চুলগুলো কপালে এসে পড়েছে। খুশিতে উচ্ছল এক বালক। চোখে মুখে দুষ্টু হাসি ছড়ানো।

কিন্তু একি! চন্দনের চোখ ছলছল করছে! ব্লটিং পেপারে কালি চুষে নেবার মতো কে যেন এক মুহূর্তে চন্দনের সব হাসিটুকু শুষে নিল। তার চোখে-মুখে এক অদ্ভুত কষ্টের অভিব্যক্তি।

গেছে। যেমন যেমন চলে তেমনই চলছে সবকিছু।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন দস্তিদার, ঘড়িতে এখন রাত দুটো। চন্দনের ছবিটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে। নিজেই নিজেকে বোঝালেন দস্তিদার—এ ধরনের

ম্যাগনিফাই গ্লাস দিয়ে বার বার পরীক্ষা করলেন

দস্তিদার দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে টেপরেকর্ডারের সুইচ অফ করে দিলেন। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন চন্দনের ছবির দিকে। দস্তিদার এবার একটু তৃপ্তি পেলেন। আবার চন্দনের ফটোগ্রাফ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। আগের মতোই চন্দন হাসতে শুরু করেছে। আবার তার চোখেমুখে বালকোচিত খুশির বন্যা।

দস্তিদার ভেবে দেখলেন—চন্দন মারা গেছে প্রায় দশ বছর আগে। তখন দস্তিদার আমেরিকায়। খবর পেলেন ঘটনার দুদিন পরে। চন্দনের বড় মামা লিখেছেন সাঁতার কাটতে গিয়ে চন্দন জলে ডুবে যায়। দস্তিদার শেষ দেখা দেখতে পান নি। উপায়ও ছিল না। স্ত্রী মারা যাবার পর চন্দনকে মামার বাড়িতেই রাখা হয়েছিল। তারপর থেকে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে দস্তিদারের প্রায় সম্পর্ক উঠে গেছে বললেই হয়।

কিন্তু আজ এসব কথা কেন ভাবছেন দস্তিদার? মৃত্যু একান্তই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রতিদিনই পৃথিবীতে অসংখ্য মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এটা ঠিকই কোন কোন মৃত্যু কোন কোন মানুষকে বিধ্বস্ত করে। চন্দনের মৃত্যুও দস্তিদারকে একেবারে ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু তারপর সবই সয়ে

দুর্বলতার কোন অর্থ নেই। হাজার মৃত মানুষের ছবিতে তিনি যে যে লক্ষণ দেখেছেন, চন্দনের ছবিতেও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

দস্তিদার আবার জ্বেলে দিলেন তীব্র আলো। চোখের সামনে তুলে নিলেন ম্যাগনিফাইং গ্লাস। মাথা নিচু করে হলদে রঙের আবিষ্কারে মত্ত হলেন দস্তিদার।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন দস্তিদার,—'না না, এ হতে পারে না। আমার গবেষণা ভুল হতে পারে না। অসংখ্য মৃত মানুষের ফটোগ্রাফে যে রঙ পাওয়া যায়, চন্দনের ফটোগ্রাফেও সে রঙ থাকতে বাধ্য। মৃত মানুষের অন্য কোন প্রতিক্রিয়া নেই।'

কথাগুলো বলতে বলতেই দস্তিদারের চোখ পড়লো চন্দনের ছবিটার দিকে। ঠিক তখনই তিনি দেখলেন চন্দনের দুচোখ আবার ম্লান হয়ে উঠেছে। যেন এখনই কাঁদবে চন্দন। তার মুখে সে হাসি উধাও। যেন ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে চন্দন!

দস্তিদার বসে পড়লেন চেয়ারে। তা হলে ভুল কোথায়? তাঁর গবেষণায়, না চন্দনের মৃত্যুসংবাদে? চন্দন বেঁচে থাকলে তার এখন বাইশ বছর বয়স হত।

পোঃ—নৈহাটি, 24 পরগণা

আমরা ভুলি কেন?

পৃথা বল

একটি ছেলে খুব আগ্রহের সঙ্গে তার মাস্টারমশাইকে একদিন পড়ার টেবিলে বসে বলেছিল, 'আচ্ছা মাস্টার-মশাই, বলতে পারেন আমরা ভুলি কেন? মনে রাখার কি কোন ওষুধ নেই? যার দ্বারা আমরা সব কিছু মনে ধরে রাখতে পারি।'

মাস্টারমশাই ছেলেটির প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন ওষুধ বাতলে দিতে পারিনি। এর কারণ মনে রাখার মতন ভোলারও প্রয়োজন আছে।

'আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অজস্র ঘটনা ঘটে চলেছে। এর সবকিছুই কি আমরা মনে ধরে রাখতে পারি? যেটা মনে রাখবো বলে আপ্রাণ চেষ্টা করি, সেটাও সঠিক পরিস্থিতিতে মনে করতে পারি না। আবার বিশেষ বিশেষ কতকগুলো ঘটনা, কোন দুঃখজনক পরিস্থিতি, অথবা মন-মুগ্ধকর বিষয় আমাদের আপনিই মনে থেকে যায়। প্রিয়জনের দুঃখকে ভুলতে চেষ্টা করলেও ভুলতে পারি না। বারে বারে তার কথা মনে পড়ে যায়। আবার ইতিহাস বা ইংরেজির কোন পড়া বহুবার পড়েও পরীক্ষায় সঠিক উত্তর অনেকেই লিখতে পারে না। কেন এমন হয়? নিশ্চয়ই এই ধরনের বিস্মৃতির পিছনে কোন কারণ আছে। মন বিজ্ঞানী রিবোট বলেন—নতুন কিছু শেখার জন্যই ভুলে যাওয়া প্রয়োজন।' আমাদের মানসিক শক্তি সীমাবদ্ধ। অজস্র বিষয় বস্তুকে স্মরণে রাখা মনের পক্ষে তো সম্ভব নয়। তাই অনাবশ্যক এবং যা প্রয়োজনীয় নয় তা যদি আমরা ভুলে না যাই তবে প্রয়োজনীয় এবং নতুন বিষয় মনে ধরে রাখা কিভাবে সম্ভব? কাজেই ভুলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা এইখানেই।' এই কথা বলে মাস্টার মশাই ছেলেটিকে একটা উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'তোমার মনে রাখার স্মৃতির ঝুলিটাকে একটা নির্দিষ্ট থলির আকারে চিন্তা করো। এবারে ভাবো এই থলির $\frac{3}{4}$ ভাগ যদি ভুসি বা অন্য কিছু দিয়ে পূর্ণ করো, তবে ব্যাগের বাকি $\frac{1}{4}$ অংশ জায়গায় তুমি চিনি বা ভাল কিছু দ্রব্য রাখতে পারবে। তাইতো? মনের ঝুলিরও নির্দিষ্ট একটা আকার আছে। অজস্র জিনিস যেমন ঐ থলিতে ভরা যায় না, ঠিক তেমনি অজস্র বিষয়বস্তুকে স্মরণে রাখা মনের পক্ষে সম্ভব নয়। অনাবশ্যক অপ্রয়োজনীয় জিনিস যদি তুমি মনে ধরে রাখো, যেমন সিনেমার কথা, খেলার কথা, রাজনীতির কথা, সাংসারিক কথা, গল্পের বই-এর কথা, তবে পড়ার বইয়ের পড়াটির কথা তুমি ভুলতে বাধ্য হবেই। কারণ মনের স্মৃতির থলিটির $\frac{3}{4}$ ভাগ তুমি ঐ সব বিষয় দিয়ে আগেই ভরে ফেলেছো। অতএব এরপর যতই রাতজেগে পড়া তৈরী করো না কেন, ঐ $\frac{1}{4}$ ভাগই তোমার স্মৃতির থলিতে আঁটবে। তার বেশি তোমার স্মৃতির ঝুলিতে জায়গা কোথায়? তাই মনে রাখতে হলে শুধু যে অনাবশ্যক অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে ভুলে যেতে হবে তা নয়, নতুন কিছু শিখতে হলে অনেক সময় অতীতের প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুও একদিন অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় এবং তখন তাকেও ভুলতে হয়। এক কথায় বিস্মৃতি অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে মন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, নতুন বিষয়কে স্মরণ রাখতে সাহায্য করে।

সাধারণত কোন বিষয় শেখবার সময় ছাত্ররা অসর্তকতা বশতঃ কতকগুলি ভুল বিষয় শিখে ফেলে। এখন এই ভুলগুলি যদি সে না ভুলে যায়, তবে তার পক্ষে শুদ্ধ বিষয়গুলি শিক্ষা করা কখনোই সম্ভব হবে না। তাই নির্ভুলকে মনে রাখতে হলে, ভুলকে ভুলতে হবে। এছাড়াও আমাদের জীবনের অনেক পুরোনো অভিজ্ঞতা, প্রিয়জনের মৃত্যু, কোন কাজে ব্যর্থতা, বন্ধুর সঙ্গে মনমালিন্য এই সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলির সবই যদি মনে থাকে, তবে মনকষ্ট বাড়ে বই কমে না। এরই জন্যে তো ভুলে যাওয়া প্রয়োজন। তাই ভুলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা মানুষের জীবনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করে।' এই বলে মাস্টার মশাই ছেলেটির কৌতূহলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার তোমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর তুমি খুঁজে পাবে। আমরা ভুলি কেন? ভুলে যাওয়ার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে, অনেক সময় স্মৃতির থলি খালি থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক বিষয়কে স্মৃতির থলিতে সংরক্ষণ করতে পারি না। এর কারণ কি? যে ছাত্রটি এলোমেলো বিষয় মনে রাখছে না, সে কেন পড়ার বিষয় মনে রাখতে পারছে না, সেক্ষেত্রে ভুলে যাওয়ার কারণ কি? এর পশ্চাতে একাধিক কারণ বর্তমান। প্রধানতঃ এই ধরনের ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় এদের বুদ্ধি কিছু কম থাকে। বুদ্ধি ছাড়াও অন্য যে সব কারণে সহজে মনে রাখা সম্ভব, তা হলো—মনে রাখার বিষয়বস্তুকে তীব্র হতে হবে, সুস্পষ্ট হতে হবে, দীর্ঘস্থায়ী হতে হবে, এবং মনযোগ আকর্ষণকারী অথবা বিষয়বস্তুটি মনের মতন হতে হবে। তবেই তাকে মনে রাখা সম্ভব হয়। আবার কোনও ঘটনা যদি সম্প্রতি ঘটে থাকে, তবে সেটাও আমাদের ভাল মনে থাকে।

স্মৃতি এবং বিস্মৃতি উভয়ই আমাদের জীবনে খুব স্বাভাবিক ঘটনা। মনে রাখার বিষয়টি যদি এই সব শর্তাবলীর অধীনে হয়, তবে তাকে মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করতে পারি এবং তাহলেই তা স্মরণে আসে। আর সংরক্ষণ করতে যখন পারি না তখনই তা ভুলে যাই। অর্থাৎ সংরক্ষণের অভাবই হল বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়া। এই বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়ার পেছনে কয়েকটি প্রধান প্রধান কারণ কাজ করে। চর্চার অভাবকেই আমরা বেশি করে ভুলে যাওয়ার কারণ বলে নির্ণয় করি। যে ছাত্রটি ঠিক মত পড়া বলতে পারছেনা তাকে, "কেন পড়া করোনি?" এই বলেই দোষারোপ করি তাই তো? কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে চর্চা না করেও অনেক বিষয় আমরা ভালভাবে মনে রাখতে পারি। এমনও দেখা যায় যে কাহিনী মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে হয়, অনেক সময় আকস্মিকভাবে মনে তা জেগে ওঠে। ভুলে যাওয়ার আরও একটা কারণ হ'ল পশ্চাদমুখী বাধ। মনে করো, কোন ছাত্র প্রথমে একটি কবিতা মুখস্থ করে সময়ের কোন বিরতি না দিয়েই, সে যদি সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের একটি অংশ মুখস্থ করে এবং প্রথমটি মুখস্থ আছে কিনা তা যদি পরীক্ষা করে দেখে, তা হলে সে দেখতে পাবে, প্রথম বিষয়টির অর্থাৎ কবিতাটির অংশবিশেষ সে ভুলে গেছে। এর কারণ দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টি মনে রাখার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করছে এবং পেছন দিক থেকে এসে প্রথম বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে পরবর্তী শেখা বিষয়টি, পূর্বের শেখা বিষয়কে মনে রাখতে যে বাধা সৃষ্টি করে, একেই বলে পশ্চাদমুখী বাধ। তাই এই পশ্চাদমুখী বাধকে এড়াতে হলে, প্রথম শেখার পর কিছুটা বিরতি দিয়ে দ্বিতীয়টা শিক্ষা করতে হয়।

মাস্টারমশাই ছেলেটিকে তার দৈনন্দিন জীবনে পশ্চাদ-মুখী বাধের একটা উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'পড়তে বসেই এই যে তুমি বাংলা পড়া তৈরী করেই ইংরেজি বা ইতিহাস পড়া করে তারপর বইটি তুলে রেখে দাও। তার পর ক্লাসে এসে বুঝতে পারো না কেন বাংলা কবিতাটার শেষের অংশ বলতে পারলে না। বাড়িতে তো ভালই পড়া তৈরী হয়েছিল। তবে ভুলে গেলাম কেন? এর কারণ ঐ পশ্চাদমুখী বাধ। যদি একটু বিরতি দিয়ে পড়তে, তবেই কবিতাটা নির্ভুলভাবে মনে থাকতো।'

ভুলে যাওয়ার আর একটা কারণের কথা মাস্টারমশাই তাকে বললেন, 'মনে রাখার অনিচ্ছা থেকেই আমরা সহজে ভুলে যাই। কোন লোককে হয়তো আমরা পছন্দ করিনা, কোনও বিষয় হয়তো তোমার ভাল লাগেনা, দেখা যায় ধীরে ধীরে সেই লোকটির কথা আমরা ভুলে গেছি। সেই বিষটাও তোমার মনে থাকে না। অবশ্য এই ভুলতে

মাস্টারমশাই বললেন, 'মনের রাখার অনিচ্ছা থেকেই আমরা সহজে ভুলে যাই।'

চাওয়ার ইচ্ছা সচেতন মনের নয়, অচেতন মনের।'

এছাড়া কোনকিছু শেখার সময় আমরা একটা বিশেষ পরিবেশ শিখি। শেখার পরিবেশের মধ্যে যে সব উপাদান থাকে সেগুলি আমাদের মনে রাখতে সহায়তা করে। অনেক সময় দেখা গেছে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে আমরা বিষয়টি মনে করতে পারিনা।

এতক্ষণ ধরে মাস্টার মশাইয়ের কথাগুলো মন দিয়ে শুনে ছাত্রটি এবার শেষ প্রশ্ন করলো, 'তা হলে মাস্টারমশাই, মনে রাখারও প্রয়োজন আছে, আবার ভোলারও প্রয়োজন আছে তাই তো? তবে মনে রাখতে হ'লে কি করতে হবে?' মাস্টারমশাই উত্তর দিলেন, প্রথম হলো অনাবশ্যক বিষয়কে ভুলতে হবে। তারপর ভুলে যাবার কারণগুলো অপসারণ করতে হবে। কি কি কারণে আমরা ভুলি সেগুলোকে বাদ দিতে হবে, পড়ার মাঝে বিরতি দিতে হবে এবং সবশেষে বলি, তুমি যে রাত্রি জেগে পড়ো, তাতে তোমার উপকার হয় না বরং অপকারই হয়। তার কারণ ঘুমের সঙ্গে মস্তিষ্কের সংরক্ষণের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। কোন বিষয় শেখার পর যদি ঘুমানো যায় তবে সংরক্ষণ ভাল হয়। এই ঘুমের সময় কোন প্রকার প্রতিরোধ হয় না। এজন্যে ঘুমের আগে যা'ই শিখবে তা ভালভাবে মনে থাকে। কঠিন পড়াগুলো তুমি মনে রাখতে যদি চাও তবে ঘুমের আগে সেগুলো তৈরী করেই ঘুমিয়ে পড়বে।

21/2 বেলগাছিয়া রোড, কলি-37

বেরিবেরি রোগের আবিষ্কার

সুনীল সরকার

সে অনেক, অনেক কাল আগের কথা। সে সময়টা ছিলো উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। তখন চীন জাপানের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ লেগেই থাকত। সেই বিবাদের পরিণতি হিসাবে মাঝে মাঝেই সাগরে চলতো লড়াই।

তখন নৌশক্তিতে চীনের চেয়ে জাপান ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। জাপানের নৌবাহিনী এবং গোলন্দাজ-বাহিনী ছিল দুর্ধর্ষ। তাই নৌযুদ্ধে চীন বার বার জাপানের কাছে পরাজিত হত।

সেই সময়ে মাঝে মাঝেই জাপানীরা সমুদ্রযুদ্ধে অবতীর্ণ হত এবং সমুদ্রে চীনের কোন জাহাজ দেখলেই তাকে আক্রমণ করত। আর সেই আক্রমণে পরাস্ত হয়ে চীনের নৌশক্তি বার বার ধ্বংস হত এবং প্রাণ দিত অনেক নাবিক বা নৌসেনাবাহিনী।

চীনারাও নাছোড়বান্দা। তারাও সুযোগ বুঝে আক্রমণ চালাতো এবং অতি সন্তর্পণে। এমনি একটি চীনা যুদ্ধ জাহাজ অতি সংগোপনে সন্তর্পণে একটি জাপানী জাহাজকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য ছিল ঐ জাপানী জাহাজটাকে কামান দেগে উড়িয়ে দেবে।

কিন্তু ধীমান এবং চতুর জাপানী নৌ-সেনাধ্যক্ষের চোখ এড়াতে পারলো না চীনা জাহাজটি। তিনি তৎক্ষণাৎ জাহাজের সমস্ত গোলন্দাজবাহিনীকে তৈরি থাকতে বললেন এবং নিজে দূরবীন নিয়ে চলে গেলেন জাহাজের ছাদে এবং সেখান থেকে চীনা জাহাজের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন।

চীনা জাহাজটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে জাপানী জাহাজটির দিকে। ক্রমশ আসছে। ধীরে ধীরে আসছে।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে জাপানী নৌ-সেনাধ্যক্ষ। দূরবীন দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করছেন। কামানের গোলার রেঞ্জের মধ্যে এলেই তিনি নিচে নেমে আসবেন এবং গোলন্দাজ বাহিনীকে আদেশ দেবেন কামান দেগে ঐ চীনা যুদ্ধ জাহাজটাকে ধ্বংস করছে।

চীনা জাহাজ আসছে। ঘড়ির ঘণ্টায় টিক টিক আওয়াজ। সব নিথর। নিস্তব্ধ। নিচে গোলন্দাজ বাহিনী তৈরি। কামানের ভিতর বারুদ ঠেসে তারা কামান দাগানোর অপেক্ষায় আছে। রেডি ওয়ান-টু-থ্রী! ব্যাস। গর্জে উঠবে কামান। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে চীনের যুদ্ধ-জাহাজ।

হ্যাঁ, নিচে নেমে এলেন সেনাধ্যক্ষ। তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপছে। এসে গেছে। এসে গেছে। তোমরা সব রেডি তো? ইয়েস্ স্যার, উই আর রেডি।

থ্যাঙ্ক ইউ। এসে গেছে। রেঞ্জের মধ্যে এসে গেছে। চালাও কামান। দাগো কামান। উড়িয়ে দাও। নিশ্চিহ্ন করো শত্রুর জাহাজকে। ধ্বংস করো। রেডি ওয়ান-টু-থ্রী।

একজন গোলন্দাজ সৈন্য ছুটে গেলো কামানের কাছে। বারুদে আগুন দিতে হঠাৎ তার হাত পা কেঁপে উঠলো। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এলো। কাঁপতে কাঁপতে সে ডেকের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো।

নৌ-সেনাধ্যক্ষ চিৎকার করে উঠলোঃ স্ট্যাণ্ড আপ্! স্ট্যাণ্ড আপ্! কামান দাগো। মাই অর্ডার। কামান দাগো।

কিন্তু হতভাগ্য সৈন্যটি আর উঠতে পারলো না।

হোয়াট নন্‌সেন্স! সেনাধ্যক্ষ রেগে সেই নৌসেনার উপর চাবুক মারতে লাগলেন।

নৌ-সেনা বেদনায় কুকড়ে হাত নেড়ে সেনাধ্যক্ষকে কি যেন বলতে চাইলো, পারলো না। অসহায় নৌ-সেনা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

এনাদার ওয়ান। কুইক্। গেট রেডি। জল্দি কামান দাগো। চীনা জাহাজ আমাদের পাল্টা আক্রমণ করছে। সেনাধ্যক্ষ গর্জে উঠলেন। কিন্তু কামান আর গর্জে উঠলো না।

দ্বিতীয় গোলন্দাজ সৈন্যটিও কামান দাগতে গিয়ে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল। সে বার বার উঠতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না।

এবার কামানের পরিবর্তে সেনাধ্যক্ষ নিজেই গর্জে উঠলেনঃ এই কে আছ, নিয়ে এসো আমার রাইফেল। বিশ্বাসঘাতকদের আমি গুলি করে মারবো। এত বড় স্পর্ধা! আমার কথায় অমান্য করা। স্টুপিডদের আমি গুলি করে মারবো। কুকুরের মত মারবো।

অস্থির, চঞ্চল, উদ্‌ভ্রান্ত সেনাধ্যক্ষ পুনরায় আদেশ

দিলেন, এনাদার ওয়ান। কামান দাগো। আরেকজন গোলন্দাজ সৈন্য এগিয়ে এলো। কামানে আগুন দিলো। কামান দাগলো। কিন্তু তারো হাত কেঁপে সেই গোলা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো।

এদিকে সেই চীনা জাহাজ এগিয়ে এলো, তারা পাল্টা আক্রমণ করলো।

অগত্যা জাপানী নৌ-সেনাধ্যক্ষ নিজের জাহাজ নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন।

বেইমান! বিশ্বাসঘাতকের দল। এবার তোদের মৃত্যু অনিবার্য। সেনাধ্যক্ষ জাহাজের সমস্ত গোলন্দাজ সৈন্যকে সারবন্দি দাঁড় করিয়ে দিলেন। এবার তিনি সকলকে গুলি করে মারবেন।

বন্দীরা মৃত্যুকে বরণ করতে সবাই একটি সরল রেখায় দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা যেন সকলেই ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। মৃত্যু ভয়ে নয়। কোন অজানা এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়। সবারই হাতপা যেন অবশ হয়ে আসছে, শিথিল হয়ে আসছে। কেউ যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সবাই ঠোঁট নাড়ছে। সেনাধ্যক্ষকে কি যেন বলতে চাইছে, অথচ পারছে না।

খবর পেলেন নৌচিকিৎসক, ছুটে এলেন। সেনাধ্যক্ষকে বললেন: আমার মনে হয় ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করছে এটা ঠিক নয়। আমি ওদের একবার পরীক্ষা করতে চাই। আপনি আমাকে অনুমতি দিন।

সেনাধ্যক্ষ চিৎকার করে উঠলেন, আপনি এদের কি পরীক্ষা করবেন? এরা কি অসুস্থ? না, এরা বিশ্বাস-ঘাতক! এদের আমি গুলি করে মারবো। এরা আমাদের দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং বিশ্বাস-ঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু।

তবু আমি বলছি নৌ-সেনাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি আমাকে একটিবার পরীক্ষা করার সুযোগ দিন। আমার মনে হয় এরা সকলেই অসুস্থ এবং অজ্ঞাত কোন রোগের দ্বারা আক্রান্ত।

'বেশ তাই হোক্। আপনি পরীক্ষা করুন। তবে মনে রাখবেন ডাক্তার, এরা যদি কোন রোগে আক্রান্ত না হয় তা হলে দেশদ্রোহিতার অপরাধে এদের মৃত্যু বরণ করতে হবে।'

আপনার কথা আমার মনে থাকবে। বলে ডাক্তার ওদের পরীক্ষা করলেন এবং বার বার। বললেন, এরা সকলেই নিরপরাধ এবং কেউ-ই বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে 'বেরিবেরি' নামক একপ্রকার রোগ।

সব কথা শুনে সেনাধ্যক্ষ আশ্বস্ত হলেন। সেনাদের প্রতি মমতায় ভরে উঠলো তাঁর মন।

সেনাধ্যক্ষ তখন ডাক্তারের কাছে কাতর মিনতি করে বললেন, এই রোগের হাত থেকে আমার নৌ-সেনা বাহিনীকে আপনি বাঁচান। দরকার হয় আমি জাপানের সম্রাটের কাছে আপনার সর্বপ্রকার সাহায্য ও গবেষণার আবেদন জানাবো। আশা করি সম্রাট তার দেশকে সুরক্ষিত রাখতে দেশসেবক নৌ-সেনাদের জন্যে সকল প্রকার অর্থ ও সাহায্য দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবেন।

হলোও তাই। জাপানী—সম্রাট এই প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং নৌ-চিকিৎসককে ডেকে বললেন, আমার সুশিক্ষিত বাহিনীকে রোগ মুক্ত করতে আপনি যে সাহায্য চাইবেন আমি তাই দেবো।

তখনও 'বেরিবেরি' রোগের কোন ঔষধ আবিষ্কার হয়নি। তাই ডাক্তার হতাশ হয়ে এই রোগ থেকে মুক্ত হবার গবেষণা শুরু করলেন। তিনি সৈন্যদের খাদ্য তালিকা পরিবর্তন করলেন। ধবধবে মিহি চালের ভাতের পরিবর্তে তাদের ঢেঁকিছাটা চালের মতো একপ্রকার লাল চালের ভাত পরিবেশন করলেন। তার সঙ্গে দিলেন তরিতরকারী, মাছ, মাংস, ডিম ও বার্লি।

অবাক কাণ্ড। একেবারে অবাক কাণ্ড। মাত্র মাস খানেকের মধ্যেই সমস্ত নৌ-সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো। ওষুধপত্র ছাড়া শুধু খাদ্যতালিকা পরিবর্তন করে জাপানের এতগুলো দেশসেবকদের সুস্থ করে তুললেন ডাক্তার।

রক্তশূন্য হাতপা ফোলা গোলন্দাজ বাহিনীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করার কৃতিত্ব অর্জন করে ডাক্তার সমগ্র জাপানে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। তাঁকে অভিনন্দন জানালেন স্বয়ং জাপানের সম্রাট, নৌসেনাধ্যক্ষ এবং আপমর জন-সাধারণ।

এভাবেই জাপানের ডাক্তার 'টাকাকি' 1885 সালে প্রথম বেরিবেরি রোগ আবিষ্কার করলেন এবং সামান্য খাদ্য তালিকা পরিবর্তন করে নৌসেনাদের সুস্থ করে তুললেন। কিন্তু তিনি বলতে পারলেন না এই রোগ কি কারণে হয়।

জাপানী ডাক্তার টাকাকির এই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে বেরিবেরি রোগ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা হয়। সেই গবেষণায় 1897 সালে বিজ্ঞানী আইকম্যান অনেকটা এগিয়ে গিয়ে বললেন, পাখীবা মুরগীদের পলিনিউরাইটিস নামক একপ্রকার পক্ষাঘাত রোগ হয়। এই রোগটির সঙ্গে

বেরিবেরি রোগের মিল আছে। কিন্তু পাখীদের কলেছাটা চালের কুঁড়া খেতে দিলে রোগটা ভালো হয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানী গ্রীন্‌স 1901 সালে আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, চালের কুঁড়ায় এমন একটি উপাদান আছে যা স্নায়ুকে সক্রিয় ও সতেজ রাখতে সাহায্য করে। তিনি আরো বললেন, পাখীদের পলিনিউরাইটিস এবং মানুষের 'বেরিবেরি' রোগ খাদ্যের মধ্যে দিয়েই হয়।

1905 সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানী ফ্লেচার গবেষণা করে বললেন,—কলে ছাঁটা পরিষ্কার চালের চেয়ে ঢেঁকিছাঁটা চাল এই রোগের একমাত্র ওষুধ হতে পারে।

উপরোক্ত সালে স্ট্যানটন বললেন, ফ্লেচারের গবেষণা ঠিক।

1906 সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ম্যাক্‌কলম এবং হপ্‌কিন্স এবিষয়ে আরো এগিয়ে গিয়ে বললেন, এই রোগে প্রোটিন, ফ্যাট ও ভিটামিন পুষ্টির জন্যে দরকার।

এরপর গবেষণা চলতে থাকলো। সর্বশেষে বিজ্ঞানী ফান্ক 1911 সালে বিস্তর গবেষণা করে বললেন, বেরিবেরি রোগটি খাদ্যের তারতম্য থেকেই হয় এবং এটি একটি অত্যাবশ্যক খাদ্যের অভাবজনিত রোগ। সাধারণত মিলের সরু চালের চেয়ে ঢেঁকিছাঁটা লাল চাল এই রোগের প্রতিষেধক। তার সঙ্গে দরকার প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন। চালের কুঁড়ার মধ্যে এই জাতীয় ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এরপরই ভিটামিন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এই সব রোগ দূর করা সম্ভব হলো।

তোমরা জানো যে, ধানের খোলসের নিচে থাকে চাল। একটি চালের দানার গোড়ার দিকে বীজ এবং দানার খোলসের নিচে থাকে কয়েকটি অ্যালুরেন গ্রেনের স্তর। চালের পুষ্টিকর উপাদানসমূহের বেশির ভাগই থাকে বীজ খোলস এবং অ্যালুরেন স্তরে। ঢেঁকিছাঁটা চালের ক্ষেত্রে বীজ, অ্যালুরেন গ্রেনের স্তরগুলি আংশিকভাবে থেকে যায়। এই কারণে কলেছাঁটা চালের তুলনায় ঢেঁকিছাঁটা চাল বেশি পুষ্টিকর।

কাজেই তোমরা বুঝতে পারছো কলেছাঁটা চাল কি বিপজ্জনক এবং তার সঙ্গে যদি কোন স্নেহপদার্থ বা প্রোটিন মানবদেহে না পড়ে তা হলে পক্ষাঘাত বা বেরিবেরি রিকেট্‌স রোগ শিশুদের যে কোন মুহূর্তে হতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে জাপানী চিকিৎসক টাকাকির 'বেরিবেরি' রোগের আবিষ্কার অবিস্মরণীয়, কি বলো ?

বি. পি. সি. জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

প্রাণী-বিচিত্রা

শৈল চক্রবর্তী

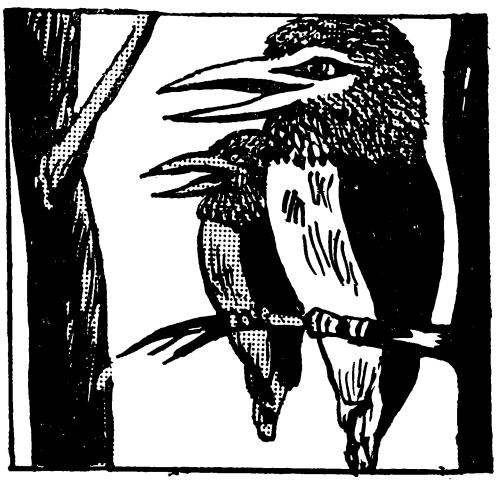

মানুষই শুধু হ্যা হ্যা হো হো করে হাসে না। শুনে তোমরা অবাক হবে, এক রকম পাখিও এই রকম হাসে, এটাই ওদের ডাক।

এ পাখি থাকে অস্ট্রেলিয়ায়, নাম হল কুকাবুরা।

তবে লোকে ঠাট্টা করে এদের নাম দিয়েছে 'জ্যাক অ্যাস্' অর্থাৎ বোকা গাধা। সূর্য অস্ত গেলেই অন্ধকারে গাছের ডালে একজন ডেকে, ওঠে আর তার দলবল অট্টহাসিতে বনাঞ্চল সরগরম করে তোলে।

উত্তর আকাশের তারামণ্ডল

বিমান বসু

আকাশের তারামণ্ডলগুলির মধ্যে যে ক'টিকে খুব সহজেই চিনে নেওয়া যায় তাদের মধ্যে দুটি হলো সপ্তর্ষি-মণ্ডল বা Great Bear এবং কাশ্যপী বা Cassiopeia। এ দুটিকে দেখা যায় ধ্রুবতারা বা Pole Star-এর দুপাশে। উত্তরের দেশগুলি থেকে (যে সব জায়গার অক্ষাংশ হলো 40 ডিগ্রী উত্তরের বেশি) সপ্তর্ষি ও কাশ্যপী তারামণ্ডল দুটিকে সারা বছরই এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। কারণ সেখানের আকাশে এদুটি কখনোই অস্ত যায় না। কিন্তু ভারত থেকে এদুটিকে এক সঙ্গে কেবলমাত্র কিছু সময়ের জন্যেই দেখতে পাওয়া যায়। বেশির ভাগ সময়ই তাদের একটিই দিগন্তের ওপরে থাকে। ব্যাপারটা 1 নং ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

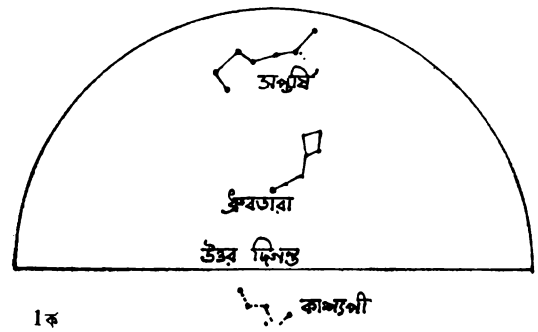

1ক

সপ্তর্ষির নাম থেকেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, তারামণ্ডলটি সাতটি তারা নিয়ে তৈরী। আসলে কিন্তু ঠিক তা নয়। আধুনিক হিসেবে সপ্তর্ষির সাতটি তারা হলো আরো বড় একটি তারামণ্ডলের অংশমাত্র। বড় তারামণ্ডলটির নাম Great Bear বা 'বৃহৎ ভাল্লুক'। তারাগুলি দিয়ে ভাল্লুকের আকৃতি কি করে তৈরী হয়েছে তা 2নং ছবিতে দেখানো হয়েছে। তবে এখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার আছে। ভাল্লুকের আসলে লেজ থাকে না, কিন্তু ছবিতে সপ্তর্ষির তিনটি তারাকে দেখানো হয়েছে ভাল্লুকের লেজের অংশ হিসেবে। এটা কেমন করে এলো তা আমাদের জানা নেই। যাই হোক, একটু লক্ষ্য করে দেখলে পরে হয়তো তোমরা সপ্তর্ষির ঐ লেজওয়ালা ভাল্লুকটিকেও চিনে নিতে পারবে। কিন্তু তার আগে এসো চিনে নেওয়া যাক সপ্তর্ষির সাত 'ঋষি'কে।

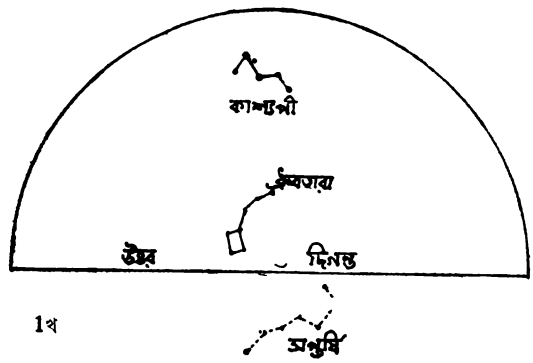

1খ

সাতটি উজ্জ্বল তারা নিয়ে তৈরী সপ্তর্ষিকে দেখতে ঠিক যেন একটা প্রশ্নচিহ্নের (?) মত। অবশ্য এই আকৃতিটা দেখতে পাওয়া যায় কেবলমাত্র তারামণ্ডলটি যখন উদয় হয় সে সময়। অস্ত যাবার সময় আকৃতিটা উল্টো (¿) দেখায়, যেমন 1নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

শীতের পর সপ্তর্ষিকে উত্তর পশ্চিম আকাশে দেখতে পাওয়া যায় মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে। তবে তারা-মণ্ডলটিকে দেখার সবচেয়ে ভাল সময় হলো গ্রীষ্মকালে। এপ্রিল, মে ও জুন মাসে রাত 8টা থেকে 10টার মধ্যে তারামণ্ডলটিকে দেখতে পাওয়া যায় ঠিক মাথার ওপরে,

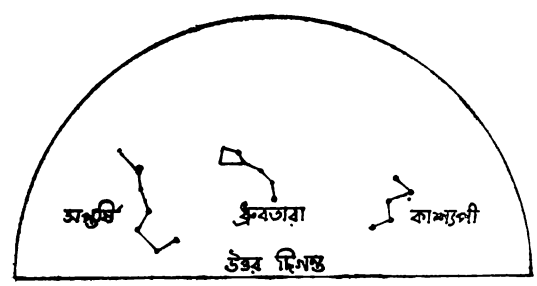

1গ

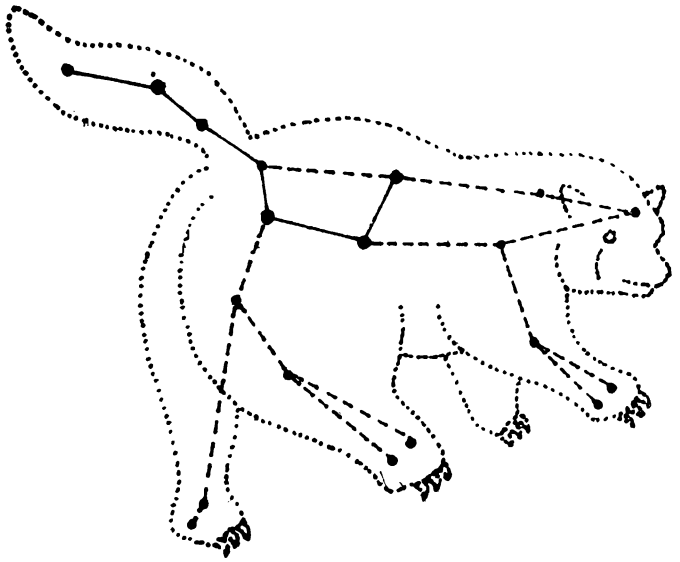

2নং চিত্র

মধ্যগমনের সময়। এই সময় আকাশ পরিষ্কার থাকলে পুরো ভাল্লুকের প্রায় সবকটি তারাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি। আগে বলেছি যে, রাতের আকাশে তারামণ্ডলগুলি প্রতিদিন 1 ডিগ্রী করে পশ্চিমে সরে যায়। ফলে পশ্চিম আকাশে একে একে তারামণ্ডলগুলির অন্তর্ধান এবং পুব আকাশে একে একে তারামণ্ডলের আবির্ভাব হয়। এর ফলে আরও একটা ব্যাপার হয়। যে সব তারামণ্ডল গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যের পর রাতের আকাশে দেখতে পাওয়া যায় তাদের ঠিক একই জায়গায় শীতকালে ভোর আকাশে দেখা যায়। আবার যে তারামণ্ডলগুলিকে শীতকালে রাতে দেখা যায় তাদের দেখতে পাওয়া যায় গ্রীষ্মকালে ভোরে। যেমন ধরো মীন রাশিকে দেখা যায় জানুয়ারী মাসে সন্ধ্যের পর। কিন্তু তারামণ্ডলটিকে তোমরা দেখতে পারো আগস্ট বা সেপ্টেমবর মাসে ভোরের আকাশে। এইভাবে একই তারা-মণ্ডল বছরের বিভিন্ন সময়ে আকাশে একই জায়গায় কোন্ কোন্ সময় দেখা যাবে তার একটা তালিকা নিচে দেওয়া হলো। তালিকা থেকে দেখতে পাবে যে, পয়লা ফেব্রুয়ারি যে তারামণ্ডলগুলি রাত 7টায় দেখতে পাওয়া যাবে তাদের আবার দেখা যাবে পয়লা অক্টোবর ভোর 3টেয়। একই হিসেবে তোমরা যে কোনও তারামণ্ডলকে কোন্ কোন্ মাসে কোন্ কোন্ সময় দেখা যাবে তা বের করে নিতে পারো।

এবারে ফিরে আসা যাক্ সপ্তর্ষিমণ্ডলের কথায়। সপ্তর্ষির সাতটি তারারই নিজস্ব নাম আছে। হিন্দু জ্যোতিষে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি উজ্জ্বল তারার নাম রাখা হয়েছে সাতজন আর্য ঋষিদের নামে, যথাক্রমে ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি। তারাগুলির বিদেশী নাম যথাক্রমে Duhbe, Merak, Phad, Megrez, Alioth, Mizar এবং Alkaid। এদের মধ্যে অঙ্গিরা হলো সবচেয়ে উজ্জ্বল (প্রভা 1·79)। যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে বশিষ্ঠের পাশে একটা ছোট্ট তারা তোমাদের চোখে পড়বে, তার নাম অরুন্ধতী। বিদেশী নাম Alcar. তারাটি এত ছোট (প্রভা 4·0) যে দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ না হলে চোখেই পড়ে না। শোনা যায় প্রাচীনকালে আরব দেশে সৈন্যদের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার জন্যে এর ব্যবহার হত।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের দুটি তারা ক্রতু ও পুলহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদুটিকে 'নির্দেশক' হিসেবে ব্যবহার করে ধ্রুবতারাকে সহজেই খুঁজে বের করা যেতে পারে; যেমন ছবিতে দেখানো হয়েছে। ধ্রুবতারা নিজে খুব একটা উজ্জ্বল তারা নয়, সেজন্যে সপ্তর্ষি ছাড়া তাকে খুঁজে বের করাটা একটু কঠিন হতে পারে।

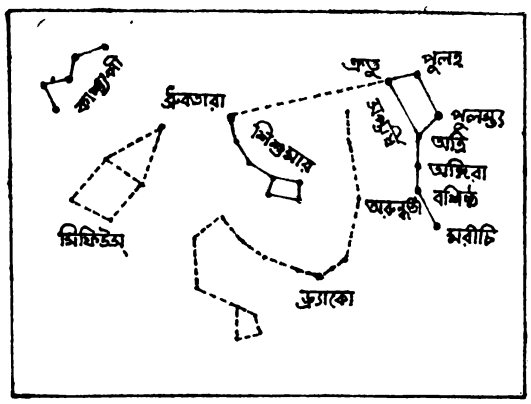

3নং চিত্র

সপ্তর্ষিমণ্ডল মধ্যগমন করে পয়লা মে রাত 9টায় এবং পয়লা জানুয়ারী ভোর 5টায়।

ধ্রুবতারাকে যদি একটু লক্ষ্য করে দেখ, তবে দেখবে

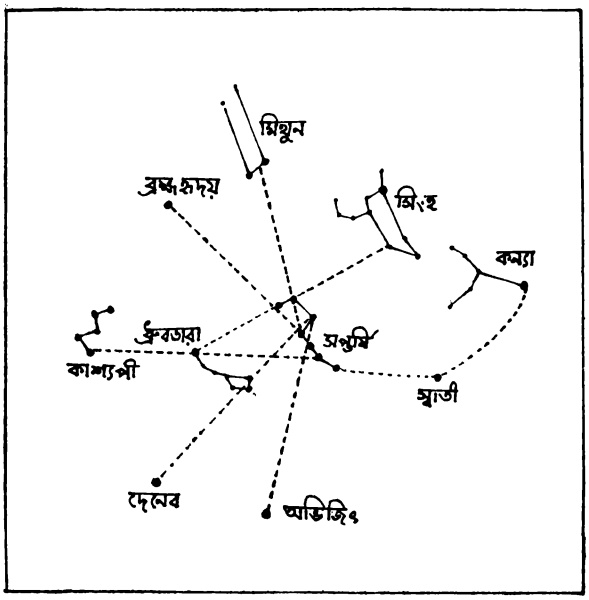

4নং চিত্র

যে, তাকে নিয়েও ছোট একটা তারামণ্ডল আছে যাকে দেখতে প্রায় সপ্তর্ষির মতো, কিন্তু অনেক ছোট। তারামণ্ডলের নাম লঘু সপ্তর্ষি বা শিশুমার। এর বিদেশী নাম Little Bear। তবে সপ্তর্ষির মতো শিশুমারের সাতটি তারা মোটেই উজ্জ্বল নয়। সেজন্যে আকাশ খুব পরিষ্কার না থাকলে তারামণ্ডলটিকে দেখতে পাওয়া খুবই কঠিন।

ধ্রুবতারার পাশে, সপ্তর্ষির ঠিক উল্টোদিকে দেখা যায় একটি সুন্দর তারামণ্ডল, নাম কাশ্যপী। ভারতের উত্তর ভাগ থেকে সপ্তর্ষি ও কাশ্যপীকে বছরে কেবল দু'বার, মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে, একই সময় উত্তর আকাশে দেখা যায়। অন্য সময় এদের একটিকেই দেখতে পাওয়া যায়, অপরটি থাকে দিগন্তের নিচে।

সপ্তর্ষির তুলনায় কাশ্যপী আকারে অনেক ছোট। কিন্তু এর সব কটি তারাও হলো খুব উজ্জ্বল, সেজন্যে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। পাঁচটি উজ্জ্বল তারা নিয়ে গঠিত কাশ্যপীর আকৃতি অনেকটা ইংরেজী অক্ষর 'M'-এর মতো, যা তোমরা সহজেই চিনে নিতে পারবে। অবশ্য বলা হয় তারামণ্ডলটিতে কোঁচে বসা এক মহিলার আকৃতি দেখা যায়, তবে সেটা খুঁজে বের করা মুস্কিল।

কাশ্যপী মধ্যগমন করে পয়লা নভেম্বর রাত 10টায় এবং পয়লা আগস্ট ভোর 4টায়।

সপ্তর্ষি এবং কাশ্যপী ছাড়াও ধ্রুবতারার কাছাকাছি আরও দু'টি তারামণ্ডল আছে, যেমন 3নং ছবিতে দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেগুলি এত ক্ষীণ যে আকাশ খুব পরিষ্কার না থাকলে তাদের দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যদি তাদের না খুঁজে পাও তবে হতাশ হবার কিছু নেই। এখনকার মতো উত্তর আকাশে সপ্তর্ষি ও কাশ্যপীকে যদি তোমরা ভালো করে চিনে নিতে পারো তবে তাদের কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি তারামণ্ডল খুঁজে নিতে পারবে, যেমন 4নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

একই তারামণ্ডল বছরের কোন্ মাসে কোন্ সময় দেখা যাবে *

1 জানুয়ারী	রাত	9টা	15 জানুয়ারী	রাত	8টা
1 ফেব্রুয়ারী	সন্ধ্যে	7টা	15 ফেব্রুয়ারী	সন্ধ্যে	6টা
1 মার্চ	বিকেল	5টা	15 মার্চ	বিকেল	4টা
1 এপ্রিল	বিকেল	3টে	15 এপ্রিল	দুপুর	2টা
1 মে	দুপুর	1টা	15 মে	দুপুর	12টা
1 জুন	সকাল	11টা	15 জুন	সকাল	10টা
1 জুলাই	সকাল	9টা	15 জুলাই	সকাল	8টা
1 আগস্ট	সকাল	7টা	15 আগস্ট	ভোর	6টা
1 সেপ্টেম্বর	ভোর	5টা	15 সেপ্টেম্বর	ভোর	4টে
1 অক্টোবর	ভোর	3টে	15 অক্টোবর	রাত	2টো
1 নভেম্বর	রাত	1টা	15 নভেম্বর	রাত	12টা
1 ডিসেম্বর	রাত	11টা	15 ডিসেম্বর	রাত	10টা

* তালিকায় দিনের সময়ও দেখানো হয়েছে, যদিও সেসময় তারামণ্ডল দেখা সম্ভব নয়।

7 U.F. কলেজ রোড, নয়া দিল্লী-1

বিশিষ্ট পক্ষিবিজ্ঞানী
অজয় হোম প্রণীত
বাংলার পাখি ২০
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

ভাষার জন্মকথা

সুমিত্রা দে

সমস্ত প্রাণিকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষই ভাষা ব্যবহারের অধিকারী। ভাষা নিয়ে মানুষ জন্মায় না। জন্মের পর শিশুর কণ্ঠ থেকে যে স্বর নির্গত হয় তা ভাষা নয়; ভাষা তাকে শিখতে হয় এবং সেটা একটা স্বভাবজাত ব্যাপার। কাউকে আলাদা করে শেখাবার প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র বড়দের মুখের ভাষা শুনেই ছোট শিশুটির মুখের ভাষা ফুটে ওঠে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো—সেই প্রাগৈতিহাসিক আদিম মানুষকে ভাষা শিখিয়েছিল কে? ব্যাপারটা একটু আলোচনা করা যাক্।

বনেজঙ্গলে গুহায় থাকা মানুষকে চিরকাল বাঁচার তাগিদে দল বাঁধতে হয়েছে। হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের আক্রমণ ঠেকাতে হলে, খাদ্যের জন্যে শিকার করতে গেলে, দশ হাত এক হওয়া প্রয়োজন। আর একসঙ্গে কাজ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ব্যবস্থা অর্থাৎ ভাবের আদানপ্রদান করা।

মুখের ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদানপ্রদান করাটা কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু যদি ভাষা না থাকে? ধরা যাক্ একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে ডাকতে চায়। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—মুখের ভাষা ছাড়াও শুধু চোখের আর হাতের ভঙ্গি করেও মানুষটি অন্যজনকে কাছে ডাকতে পারে। প্রয়োজনবোধে আমরাও ডাকি। একজন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে, তার উত্তরে বলতে চাই হ্যাঁ। উত্তরটা মুখের ভাষায় ব্যক্ত না করে, ঘাড় হেলিয়ে ইঙ্গিতে বলা যেতে পারে। অর্থাৎ মুখের ভাষার সঙ্গে মানুষের অঙ্গভঙ্গির সম্পর্কটা বেশ গভীর।

ভাষা সৃষ্টির গোড়াতে অঙ্গভঙ্গিই ছিল প্রধান। কল্পনা করা যাক্ আদিম মানুষ দল বেঁধে শিকার করতে বেরিয়েছে, তখনও তারা কথা বলতে পারে না। জিহ্বাকে সুবিধামত নাড়াবার জায়গা তখনও তৈরী হয় নি। মানুষের মগজের যে অংশটা কথা বলার ব্যাপারটা চালনা করে তাও গড়ে ওঠে নি। কেবলমাত্র অস্পষ্ট গোঙানি ছাড়া আর কিছুই সে আয়ত্ত করতে পারে নি। অথচ শিকার করতে বেরিয়ে এই মানুষদের চোখ ও কান খুবই সজাগ। কোথাও হয়তো খস্ খস্ আওয়াজ হলে, সঙ্গে সঙ্গে তারা সংকেত পেয়ে যায়। এক এক রকমের সংকেতের এক এক অর্থ। কখনও বুঝতে হবে বিপদ আসছে, সাবধান হওয়া দরকার, কখনও বুঝতে হবে শিকার ছুটে পালাচ্ছে, পেছনে ধাওয়া করা দরকার। এই বিষয়ে জন্তুজানোয়ারদের সঙ্গে মানুষের অনেকখানি মিল আছে।

তফাৎ আসছে পরের পর্বে। একজন মানুষ যদি হরিণ ছুটে যাবার সংকেত পায়, তা হলে সে অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে দলের অন্যান্যদের সংকেতটি জানিয়ে দিতে পারে। এভাবে জানিয়ে দেওয়াকে বলে সংকেতের সাহায্যে সংকেত। মানুষের ভাষা ধীরে ধীরে সংকেতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছিল।

গোড়ার দিকে মানুষ যখন সবে সামান্য দু-একটা হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখেছে, তখন দু একটা অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করা চলত। কিন্তু তারপর হাতিয়ার যত জটিল হয়ে ওঠে, ততই তার অভিজ্ঞতা বাড়ে, ক্রমেই নানা ধরনের মনের ভাব প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে অঙ্গভঙ্গি, যাকে বলা হয়েছে সংকেতের সংকেত, তাও নানা ধরনের হ'য়ে ওঠে।

এবার মানুষের মগজের কথাটাও একটু ভেবে দেখা দরকার। আগে যে মগজকে সামান্য দু একটা সংকেতের মানে বুঝতে হত, আর সেইমত চেষ্টা নামক নার্ভের মারফৎ অঙ্গচালনা করতে হত, সেই মগজকেই এখন হাজারটা সংকেতের মানে বুঝতে হচ্ছে। কাজেই মগজটি আর আগের মতো ছোটটি নেই, কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়তনও বেড়েছে। তাই মগজকে আয়তনে বাড়তে দেওয়ার জন্যে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন। চোয়ালের হাড়কে ছোট হয়ে এই জায়গা দিতে হয়েছে। আবার চোয়ালের হাড় ছোট হতে পেরেছে, কারণ মানুষের হাতের নিপুণতা বেড়েছে। মানুষকে বনমানুষের মতো চোয়ালের জোরে ছেঁড়াখোঁড়ার কাজ করতে হয় না, সে এখন নিজের তৈরী হাতিয়ারের সাহায্যে কাজ হাসিল করে।

এইভাবে হাতিয়ারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের সংকেত দেবার ও বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শুধু অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে সংকেত দিতে গেলে অসুবিধে হলো—রাত্রির অন্ধকারে ও গাছপালার আড়াল থেকে সংকেত দেওয়া চলে না। তাই গলার আওয়াজকেই মানুষ প্রাধান্য দিল বেশি। আস্তে আস্তে জিহ্বাকে নানাভাবে নাড়াবার ক্ষমতা আয়ত্ত করে মানুষের গলা থেকে নানা ধরনের আওয়াজ বেরিয়ে আসতে থাকে। বিশেষ বিশেষ সংকেতের জন্যে বিশেষ বিশেষ ধরনের আওয়াজ সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মায়। এই অবস্থায় শেষ পর্যন্ত আওয়াজগুলো হয়ে ওঠে আসল এবং অঙ্গভঙ্গি হয়ে ওঠে তার সহায়ক। ওদিকে মগজের মধ্যেও বিশেষ একটা অংশ তৈরী হয়েছে স্বরযন্ত্রকে চালনা করার জন্যে। এইভাবে মানুষের মুখে ভাষা ফুটে ওঠে।

কোয়ার্টার নং G/7A, এরিয়া 5, মাইথন বাঁধ, ধানবাদ

গ সা গু এবং ল সা গু নির্ণয়

অসীম মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ শ্রেণীতে গ. সা. গু. এবং ল. সা. গু. বিষয়-গুলির সঙ্গে গণিতশিক্ষার্থীদের প্রথম পরিচয় ঘটে। বিষয়-গুলির ওপর পারদর্শিতা লাভ করতে গেলে একটি সংখ্যাকে কয়েকটি সংখ্যার গুণফল হিসেবে প্রকাশ করার কৌশল জানা চাই। দুটি বা অধিক সংখ্যক সংখ্যার গুণফল নির্ণয় এর আগেই (নিম্ন শ্রেণীতে) ছাত্র-ছাত্রীরা শিখে থাকে। এখন গুণফল থেকে গুণ্য এবং সম্ভাব্য গুণককে খুঁজে বার করতে হবে। গুণফল 12 দেওয়া থাকলে এটিকে আমরা 6×2 বা 3×4 বা $2\times2\times3$ ইত্যাদি লিখতে পারি। যে যে সংখ্যা গুণ করলে প্রদত্ত সংখ্যা পাওয়া যায়, সেই সংখ্যাগুলিকে প্রদত্ত সংখ্যার উৎপাদক বা গুণনীয়ক বলে ; তা হলে 2,3,4,6 প্রত্যেকটি 12-এর উৎপাদক বা গুণনীয়ক। আবার 12-কে 1×12 -ও লেখা যায়, শুধু 12-কেন, যে কোনো সংখ্যাকেই 1 এবং সেই সংখ্যার গুণফল হিসেবে লেখা যায়। এর অর্থ হলো 1 সব সংখ্যারই উৎপাদক এবং প্রতি সংখ্যাই নিজের উৎপাদক। যখন কোনো সংখ্যাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণের প্রশ্ন ওঠে তখন 1 এবং সেই সংখ্যাটিকে উৎপাদক হিসেবে ধরা হয় না। আলোচ্য নিবন্ধে সংখ্যা বলতে অখণ্ড বা পূর্ণ সংখ্যাকেই বোঝানো হবে।

অনেক সংখ্যা আছে যা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় না, যেমন 11, 13 ইত্যাদি। এই সব সংখ্যাকে (যা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় না) মৌলিক বা অভাজ্য সংখ্যা বলে। এক কথায় মৌলিক সংখ্যার কোন উৎপাদক নেই। অন্যান্য সংখ্যাগুলিকে (যা মৌলিক নয়) অমৌলিক বা কৃত্রিম সংখ্যা বলে। স্পষ্ট যে প্রতিটি জোড় সংখ্যা (2 ছাড়া) কৃত্রিম সংখ্যা অর্থাৎ মৌলিক নয়। সব মৌলিক সংখ্যাই বিজোড় (2 বাদে), কিন্তু সব বিজোড় সংখ্যা মৌলিক নয়। কোনো সংখ্যাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার অর্থ হলো, সেই সংখ্যাটি মৌলিক সংখ্যার গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা। এমন হতে পায়ে যে একটি মৌলিক উৎপাদক একাধিকবার আছে, যেমন $24=2\times2\times2\times3$; এখানে উৎপাদক 2 (মৌলিক) তিনবার আছে।

একই সংখ্যা একাধিকবার গুণিত হলে, তা লেখার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে, যেমন 2 তিনবার গুণিত হলে, লেখা হবে 2^3 ; সংখ্যার ডানদিকে সামান্য উঁচুতে লেখা সংখ্যাটিকে সেই সংখ্যার ঘাত বলে, সংখ্যাটি কত-বার গুণ করা হয়েছে তা এই ঘাত নির্দেশ করে। আরও কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে, $25=5\times5=5^2$ $3^4=3\times3\times3\times3=81$। বলা বাহুল্য সব সংখ্যার ঘাত 1, অর্থাৎ $3=3^1$। বিভিন্ন ঘাতযুক্ত একই সংখ্যার গুণফল নির্ণয়ের সময় ঘাতগুলি যোগ করা হয়, যেমন $2^3\times2^4=2^{3+4}=2^7$, কারণ $2^3\times2^4=\{2\times2\times2\}$ $\{2\times2\times2\times2\}=2\times2\times2\times2\times2\times2\times2$ (7 বার) $=2^7$।

এখন 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যাসমূহের মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো। যে সংখ্যাগুলি মৌলিক সেগুলির পাশে 'মৌ' উল্লেখ করা হলো। কোনো সংখ্যাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণের সময় এই তালিকাটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

[1 সংখ্যাটিকে অনেক গণিতবিদ মৌলিক বলেন না, বিশেষ সংখ্যা বলে আখ্যা দেন]

101 থেকে 200 পর্যন্ত সংখ্যাগুলিকে এইভাবে উৎপাদকে বিশ্লেষিত করে একটি তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। ধারাপাতের কুড়ি পর্যন্ত নামতা কণ্ঠস্থ থাকা অত্যাবশ্যক। শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য 101 থেকে 200-এর অন্তর্বর্তী মৌলিক সংখ্যাগুলির তালিকা নিচে দেওয়া হলো ! এই সংখ্যাগুলিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণের চেষ্টা নিরর্থক !

101, 103, 107, 109; 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199।

এখন দুই বা অধিক সংখ্যক সংখ্যার গ. সা. গু. এবং ল. সা. গু. নির্ণয়ের সমস্যায় আসা যাক। প্রথমে কথা দুটির অর্থ পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন।

গ. সা. গু. কথাটি কয়েকটি কথার সংক্ষিপ্তরূপ। পুরো হলো গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। গরিষ্ঠ (গুরু+ইষ্ঠ) কথার অর্থ হলো সব চেয়ে বড় বা বৃহত্তম ; সাধারণ

1-মৌ	$21=3\times7$	41-মৌ	61-মৌ	$81=3^4$
2-মৌ	$22=2\times11$	$42=2\times3\times7$	$62=2\times31$	$82=2\times41$
3-মৌ	23-মৌ	43-মৌ	$63=3^2\times7$	83-মৌ
$4=2^2$	$24=2^3\times3$	$44=2^211$	$64=2^6$	$84=2^2\times3\times7$
5-মৌ	$25=5^2$	$45=3^2\times5$	$65=5\times13$	$85=5\times17$
$6=2\times3$	$26=2\times13$	$46=2\times23$	$66=2\times3\times11$	$86=2\times43$
7-মৌ	$27=3^3$	47-মৌ	67-মৌ	$87=3\times29$
$8=2^3$	$28=2^2\times7$	$48=2^4\times3$	$68=2^2\times17$	$88=2^3\times11$
$9=3^2$	29-মৌ	$49=7^2$	$69=3\times23$	89-মৌ
$10=2\times5$	$30=2\times3\times5$	$50=2\times5^2$	$70=2\times5\times7$	$90=2\times3^2\times5$
11-মৌ	31-মৌ	$51=3\times17$	71-মৌ	$91=7\times13$
$12=2^2\times3$	$32=2^5$	$52=2^2\times13$	$72=\ ^3\times3^2$	$92=2^2\times2^3$
13-মৌ	$33=3\times11$	53-মৌ	73-মৌ	$93=3\times31$
$14=2\times7$	$34=2\times17$	$54=2\times3^3$	$74=2\times37$	$94=2\times47$
$15=3\times5$	$35=5\times7$	$55=5\times11$	$75=3\times5^2$	$95=5\times19$
$16=2^4$	$36=2^3\times3^2$	$56=2^2\times7$	$76=2^2\times19$	$96=2^5\times3$
17-মৌ	37-মৌ	$57=3\times19$	$77=7\times11$	97-মৌ
$18=2\times3^2$	$38=2\times19$	$58=2\times29$	$78=2\times3\times13$	$98=2\times7^2$
19-মৌ	$39=3\times13$	59-মৌ	79-মৌ	$99=3^2\times11$
$20=2^2\times5$	$40=2^3\times5$	$60=2^2\times3\times5$	$80=2^4\times5$	$100=2^2\times5^2$

কথাটির অর্থ সকল বা সব ; গুণনীয়ক (কোনো সংখ্যার) কথার অর্থ, এমন একটি সংখ্যা 'যার দ্বারা' সংখ্যাটি ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না। এখানে সাধারণ কথাটি গুণনীয়ক কথার বিশেষণ তাই 'সাধারণ গুণনীয়ক' কথার অর্থ হলো, সেই গুণনীয়ক বা উৎপাদক যা সকল সংখ্যার মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। দুই বা অধিক সংখ্যক সংখ্যার গ, সা, গু বলতে তা হলে এমন একটি সংখ্যা বোঝাবে যা প্রতিটি সংখ্যার মধ্যে উৎপাদক হিসেবে থাকবে, কিন্তু এর থেকে 'বড়' কোনো সংখ্যা সব সংখ্যার উৎপাদক হিসেবে থাকবে না।

উদাহরণস্বরূপ, 16 এবং 24 সংখ্যা দুটির গ. সা. গু, হচ্ছে 8, কেননা 8 সংখ্যাটি 16 এবং 24 উভয় সংখ্যারই উৎপাদক বা গুণনীয়ক [লক্ষণীয় $16=8\times2$; $24=8\times3$] এবং 8 এর অধিক কোন সংখ্যা 16 এবং 24 এর সাধারণ উৎপাদক নয়। প্রকৃতপক্ষে 16 এবং যা সংখ্যা দুটির সাধারণ উৎপাদকগুলি হলো 2, 4, 8 ; এগুলির মধ্যে বৃহত্তমটি 8। কাজেই 16 এবং 24-এর গ. সা. গু. 8।

গ. সা. গু. নির্ণয়ের পদ্ধতি কি ? প্রথমে প্রদত্ত সংখ্যাগুলিকে ঘাতসহ মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষিত করে নিতে হবে, তারপর যে মৌলিক উৎপাদকগুলি [ঘাতব্যতিরেকে] সব কটি সংখ্যায় বিদ্যমান, সেই উৎপাদকগুলিকে সংগ্রহ করতে হবে ; সর্বনিম্ন ঘাতসহ এই মৌলিক উৎপাদকগুলির গুণফলই হবে নির্ণেয় গ সা. গু.।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে গ, সা, গু. নির্ণয়ের পদ্ধতি স্পষ্ট করা যাক।

উদাহরণ ঃ 24 এবং 54 সংখ্যা দুটির গ, সা, গু নির্ণয় কর।

সমাধান—প্রথম ধাপে ঘাতসমূহে (মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ) ঃ $24=2^3\times3$

$54=2\times3^3$

(তালিকা দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় ধাপ ঃ সাধারণ মৌলিক উৎপাদক—2, 3

তৃতীয় ধাপ ঃ সাধারণ মৌলিক উৎপাদকগুলির সর্বনিম্ন ঘাত—1 (2-এর), 1 (3-এর)

চতুর্থ ধাপ ঃ নির্ণেয় গ, সা, গু $=2^1\times3^1=6$

উদাহরণ ঃ 336, 224 এবং 504 সংখ্যাগুলির গ, সা, গু, নির্ণয় কর।

সমাধান—প্রথম ধাপ (ঘাতসহ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ) $336=2^4\times3\times7$

$224 = 2^5 \times 7$

$504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$

দ্বিতীয় ধাপ (গ, সা, গু, নির্ণয়ের সারণী)

সাধারণ মৌলিক উৎপাদক	ঘাতসমূহ	সর্বনিম্নঘাত	গ. সা. গু-র উৎপাদক
2	4, 5, 3	3	2^3
7	1	1	7^1

গ. সা. গু. $= 2^3 \times 7^1 = 8 \times 7$
$= 56$

[দ্রষ্টব্য : এখানে উৎপাদক '3' 224 সংখ্যাটিতে নেই, তাই এটি সাধারণ উৎপাদক নয়। কাজেই এটি সারণীতে বর্জিত হলো]

গ. সা. গু. সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় :

(ক) দুটি একই সংখ্যার গ. সা. গু. সেই একই সংখ্যা।

উদাহরণ : 15 এবং 15-র গ. সা. গু 15।

(খ) দুটি সংখ্যার মধ্যে যদি একটি অপরটির উৎপাদক হয়, তা হলে ছোট সংখ্যাটি দু'টি সংখ্যার গ.সা.গু.।

উদাহরণ : 17 এবং 85-র গ. সা. গু 17 কারণ ক্ষুদ্রতর সংখ্যা 17, 85-র উৎপাদক।

(গ) দুটি সংখ্যার মধ্যে যদি কোন সাধারণ উৎপাদক না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সংখ্যাদ্বয়ের গ.সা.গু.। এই প্রকার সংখ্যাদ্বয়কে পরস্পর মৌলিক বলা হয়।

উদাহরণ : 15 এবং 68-র গ. সা. গু, 1 সংখ্যা দুটি পরস্পর মৌলিক।

(ঘ) সংখ্যাগুলি গ. সা. গু. দ্বারা সর্বদা বিভাজ্য হবে। যেমন গ. সা. গু. 6 দ্বারা 24 এবং 54 উভয়েই বিভাজ্য।

(ক) 1 এবং যে কোন সংখ্যার গ. সা. গু 1

ওপরোক্ত ধর্মগুলি বা বৈশিষ্ট্যগুলি দুটির বেশী সংখ্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এবারে ল. সা. গু. বিষয়ক আলোচনায় আসা যাক। লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ল.সা.গু। লঘিষ্ঠ (লঘু+ইষ্ঠ) কথার অর্থ হলো সবচেয়ে ছোট। সাধারণ কথাটির অর্থ সব বা সকল; এখানে সাধারণ কথাটি পরবর্তী গুণিতক কথাটির বিশেষণ। গুণিতক (কোন সংখ্যার) অর্থ হলো এমন একটি সংখ্যা 'যাকে' সংখ্যাটি দিয়ে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না। যে গুণিতক সকল সংখ্যার গুণিতক, সেই গুণিতকই সাধারণ গুণিতক। দুই বা অধিক সংখ্যক সংখ্যার ল. সা গু বলতে এমন একটি সংখ্যা বোঝাবে প্রতিটি সংখ্যাই যার উৎপাদক বা যেটি প্রতিটি সংখ্যার গুণিতক, ; কিন্তু এর থেকে 'ছোট' কোন সংখ্যা সংখ্যাগুলির গুণিতক হবে না। উদাহরণস্বরূপ 16 এবং 24 সাংখ্যা দুটির ল.সা.গু 48। কেননা 16 এবং 24 উভয়েরই (সাধারণ) গুণিতক 48 [লক্ষণীয় : $3 \times 16 = 48$, $2 \times 24 = 48$]; 48 থেকে ক্ষুদ্রতর কোন সংখ্যা 16 এবং 4-এর সাধারণ গুণিতক নয়। প্রকৃতপক্ষে, 16 এবং 24-এর সাধারণ গুণিতক অনেকগুলি 48, 96, 144, 192 ইত্যাদি ; কিন্তু সবগুলি গুণিতকের মধ্যে 48 সবচেয়ে ছোট। কাজেই 48, 16 ও 24-এর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক।

ল. সা. গু. নির্ণয়ের পদ্ধতি কি? প্রথমে প্রদত্ত সংখ্যাগুলিকে ঘাতসহ মৌলিক উৎপাদক (ঘাতব্যতিরেকে) সংগ্রহ করতে হবে ; শেষে সর্বোচ্চ ঘাতবিশিষ্ট এই মৌলিক উৎপাদকগুলির গুণফলই হবে নির্ণয় ল. সা. গু.।

সমাধান—প্রথম ধাপ (ঘাতসহ মৌলিক উৎপাদককে বিশ্লেষণ) $27 = 3^3$

$35 = 5 \times 7$

$45 = 3^2 \times 5$

$49 = 7^2$ (তালিকা দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় ধাপ (ল. সা. গু. নির্ণয়ের সারণী

মৌলিক উৎপাদক	ঘাতসমূহ	সর্বোচ্চঘাত	ল. সা. গু-এ উৎপাদক
3	3, 2	3	3^3
5	1	1	5^1
7	1, 2	2	7^2

ল. সা. গু $= 3^3 \times 5^1 \times 7^2$
$= 27 \times 5 \times 49 = 6615$

[লক্ষণীয় : এখানে কোন উৎপাদককে প্রতিটি সংখ্যায় থাকার প্রয়োজন নেই]

ল. সা. গু সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় :

(ক) দুটি একই সংখ্যার ল. সা. গু. সেই একই সংখ্যা (উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন)।

(খ) দুটি সংখ্যার মধ্যে একটি অপরটির উৎপাদক হলে, বড় সংখ্যাটি সংখ্যা দুটির ল. সা. গু।

উদাহরণ 17 এবং 45-র ল. সা. গু 85

28/4/2/1/B, শ্রীমোহন লেন, কলি-26

কচুরিপানা

মিহির সরকার

ছোট ছোট বিন্দুর মতো। দূর থেকে দেখলে মনে হবে পুকুরটার বুকে সবুজ চাদর বিছানো। হ্যাঁ, কচুরিপানার কথা বলছি। পশ্চিম বাংলার প্রায় ডোবায়, রেললাইনের পাশের খালে কমবেশি কচুরিপানা দেখা যায়।

কচুরিপানা আমাদের কাছে বিদেশী অতিথি বলা যায়। ব্রাজিল বাসিন্দা এই কচুরিপানা সম্ভবত 1895 সালে আমদের দেশে আসে।

জলাশয়ে এদের বাস। বংশ বিস্তারও জলাশয়ে। মাত্র এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে তর তর করে দুই-থেকে তিনগুণ সংখ্যক হয়ে যায়। খাদ্য—জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি।

কচুরিপানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দূষিত জল থেকে খুব তাড়াতাড়ি খনিজ পদার্থ শোষণ করে নিজের দেহের পুষ্টি সাধন করতে পারে। ভারী ধাতু শোষণ করে দেহে জমিয়ে রাখে। দূষিত জলে কচুরিপানার খাদ্য অনেক, তাই খুব দ্রুত বংশ বিস্তার করতে পারে। আর জলের মধ্যে দ্রবীভূত বেশি নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সরিয়ে ফেলতে ওস্তাদ। ফলে জল দ্রুত পরিশ্রুত হয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বলে কচুরিপানা জলের দূষণ প্রায় 90 শতাংশ কমায়। আর আলাদাভাবে 70 শতাংশ নাইট্রোজেন, 60 শতাংশ ফসফরাস ও 90 শতাংশ জৈব-কার্বন দূষিত জল থেকে কমিয়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু অল্পবয়স্ক কচুরিপানা যখন বড় হয়ে যায় তখন তাদের জল পরিশ্রুত করার ক্ষমতা থাকে না, বরং মূলগুলো পঁচে জলে দুর্গন্ধ হয়। তাই বড় কচুরিপানাকে সময়মতো তুলে ফেলা উচিত। সংগৃহীত এই কচুরিপানা আমাদের জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায়। রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যায়। গরু ছাগল ও মহিষের খাদ্য এই বড় কচুরিপানা মন্দ নয়।

দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইনর্জিনিয়ারিং রিসারচ ইনসটিটিউট এক সমীক্ষায় জানান—কচুরিপানা থেকে বায়োগ্যাস তৈরী ও পরিবর্ত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। মূলত কৃষিকাজ এবং গৃহস্থালীর জন্যে প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র যন্ত্রাদিতে এই গ্যাস ব্যবহার করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

কচুরিপানা মাছ চাষের ক্ষেত্রে সমস্যা বটে। কারণ মাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান কচুরিপানা শোষণ করে নিজের দেহে পোকা-মাকড়ের নিশ্চিন্ত বাসস্থান করে দেয়।

পোঃ বিধানগড়, কলিকাতা-66

ফ্লজিস্টন

অনন্তকুমার দত্ত

বিজ্ঞানীরা এককালে বস্তুর দহন সম্পর্কে ধারণা করতেন যে, পদার্থের মধ্যে এমন কোনো কিছু অবস্থান করে যা ঐ পদার্থকে জ্বলতে সহায়তা করে। এই ধারণা সুদৃঢ়ভাবে ব্যাখ্যা করেন রসায়ন-বিজ্ঞানী স্টাহল। তিনি বলেন যে, সমস্ত পদার্থের মধ্যেই এমন একটি পদার্থ থাকে যা ঐ সমস্ত পদার্থকে জ্বলতে সহায়তা করে। এই পদার্থটি এমনই ভৌতিক যে চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না। কেবল পদার্থের মধ্যে উপস্থিত থেকে তার দহনক্রিয়া ঘটাবার পথ প্রশস্ত করে। স্টাহল এই কাল্পনিক পদার্থটির নাম দেন 'ফ্লজিস্টন'। ফ্লজিস্টনের বাংলা অর্থ 'অগ্নি-উৎপাদক'। কয়লা, কাঠ, কাগজ প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে ফ্লজিস্টন বেশি পরিমাণে থাকে বলে এই সকল পদার্থ সহজে দাহ্য। আবার মাটি পাথর প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে ফ্লজিস্টন অতি অল্প পরিমানে আছে বলে তা সহজে দাহ্য নয়। কোন দাহ্য পদার্থের দহন ঘটালে ঐ পদার্থ থেকে ফ্লজিস্টন উবে যায়। সেরূপ কয়লা পোড়ালে তা থেকে ফ্লজিস্টন চলে যায়, শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকে ছাই। অর্থাৎ ছাই + ফ্লজিস্টন = কয়লা বা কয়লা— ফ্লজিস্টন = ছাই।

কিন্তু এই পদার্থটি ছিল নিতান্তই কল্পনীয়। এর অস্তিত্বের কোনও বাস্তব প্রমাণ ছিল না। একটি উদাহরণ দ্বারাই তা বুঝতে পারা যায়। একটি লৌহ টুকরোকে পোড়ালে টুকরোটি লৌহভস্মে পরিণত হয়; অর্থাৎ তা থেকে ফ্লজিস্টন পরিত্যক্ত হয়। যদি লৌহ থেকে ফ্লজিস্টন পরিত্যক্ত হয় তবে নিশ্চয় লৌহভস্মের ওজন হ্রাস পাবে। কিন্তু তুলাযন্ত্রে ওজন নিলে দেখা যাবে যে, ভস্মের ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ ঘটনাটি সেসময়কার বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে পড়ে নি। এর যথার্থ কারণ সেসময় তুলাযন্ত্রের ব্যবহার সুরু হয় নি।

এই কাল্পনিক অসত্য ফ্লজিস্টনের প্রভাব থেকে মুক্ত করার পথ সূচনা করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদ্বয় শিলী ও প্রিসটলে। তাঁরা দুজন পৃথক পৃথক ভাবে অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। কিন্তু ফ্লজিস্টন তত্ত্ব এমনভাবে তাঁদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছিল যে, তাঁরা অক্সিজেনকে ফ্লজিস্টন-বিহীন গ্যাস বলে মনে করেন।

এরপর আসেন বিজ্ঞানী ল্যাভয়াসিয়ার। তিনি তাঁর পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে, পদার্থের মধ্যে কোনো ফ্লজিস্টন নেই। এটি কল্পনামাত্র। কোন পদার্থ দহনের প্রধান কারণ হলো যে, বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন থাকে।

ঠাকুর কলোনী, চাকদহ, নদীয়া

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবুজ বনের গান

[তিন] কাত্তি ! কাত্তি !

এপ্রিলের এক ঝরঝরে বৃষ্টিধোওয়া বিকেলে কোকোসের 72নং দ্বীপ রুবি আইল্যাণ্ডে পৌঁছে মনে হচ্ছিল একি স্বর্গে এলাম ? এ দ্বীপ যেন প্রকৃতি নিজের হাতে যত্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন। কত ফুল কত পাখি কত প্রজাপতি !

কর্নেলের আবার প্রজাপতির পেছনে ছুটোছুটির বাতিক আছে। কিন্তু আশ্বস্ত হয়ে লক্ষ্য করলাম, উনি জর্জ ব্যুগেনভিলির সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলতে ব্যস্ত। 'সামোয়া' এই দোতলা হোটেলের নাম। দক্ষিণের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। অদূরে শাদা বালিতে ঢাকা বেলাভূমি। ভারত মহাসাগরের ব্ল্যাকওয়াটার এখানে বেশ শান্ত ও ভদ্র। কারণ মাইল-খানেক দূরে দ্বীপটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোরাল রীফ বা প্রবাল-পাঁচিল। পাঁচিলে জায়গায়-জায়গায় ভাঙন আছে। সেই ভাঙন দিয়ে সমুদ্রের জল গর্জন করতে করতে ব্ল্যাকওয়াটারে ঢোকামাত্র শান্ত হয়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘ জার্ণিতে আমি ক্লান্ত। কলকাতা থেকে বিমানে জাকার্তা। জাকার্তা থেকে সামরিক বাহিনীর ছোট্ট একটা বিমানে এই রুবি দ্বীপে পৌঁছেছি। সরকার কিওটা-রহস্য নিয়ে বরাবর মাথা ঘামান। তাই সবরকম সাহায্য তাঁদের কাছে পাওয়া যাবে।

কফি এবং একজাতীয় সামুদ্রিক মাছের কেক খাওয়ার পর কর্নেল জয়ঢাক সায়েবকে নিয়ে কোথায় যেন বেরুলেন। বলে গেলেন, 'ঘণ্টা দুই পরে ফিরব। তুমি ইচ্ছে করলে বীচে ঘোরাঘুরি করতে পারো—কোনো ভয় নেই। রুবি খুব নিরাপদ জায়গা।'

আমার আঁতে লাগল। আমি বুঝি ভীতু মানুষ ? ওঁরা সরকারী স্টেশনওয়াগন গাড়িতে রওনা হয়ে গেলে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। উঁচু-নিচু সুন্দর পাহাড়ী রাস্তায় ওঁদের গাড়িটা গাছপালার আড়ালে চলে গেল। একানড়ের মতো নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বীচে মানুষজন খুবই কম। নারকেল বীথির পাশে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর দেখি, একটা বোর্ডে কয়েকটি ভাষায় লেখা আছে, 'সাবধান। সামনে বিপদ। আর এগোবেন না।'

আমি তো হকচকিয়ে গেছি। বিপদ ! কিসের বিপদ ? হঠাৎ আমার কয়েক ইঞ্চি তফাতে গদাম করে একটা নারকেল পড়ল। এমনি বিপদটা টের পেয়ে গেলাম। ওই প্রকাণ্ড ঝুনো নারকেল আমার মাথায় পড়লে এখনই অক্কা পেতে হত !

রাগ হল। কর্নেল যে বলে গেলেন, খুব নিরাপদ জায়গা ! নারকেল গাছগুলো থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে বীচে বসে পড়লাম। সামনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দূরের প্রবাল-পাঁচিলটা ঝলমল করছে। আদিবাসীদের নৌকো কালো হয়ে ভেসে আছে কোথাও। ওরা হয়তো বেলা শেষে মাছ ধরতে বেরিয়েছে !

পায়ের শব্দে ঘুরে দেখি, একজন বুড়োমানুষ। তোবড়ানো গাল, চীনাদের মতো মুখ, বেঁটে—কিন্তু কাঠামোটি চওড়া। তার মাথায় নীল টুপি দেখেই বুঝলাম, লোকটা জাহাজী। একটু হেসে সে বলল, 'স্পিক ইংলিশ ?'

কিছুক্ষণের মধ্যে আলাপ হয়ে গেল। বুড়ো একজন প্রাক্তন তিমিশিকারী। নাম রাজাকো। বাড়ি ছিল এক-সময় বান্দুং-এর ওদিকে একটা ছোট্ট শহরে। এখানে এখন সে স্থায়ী বাসিন্দা। বুড়ো হয়ে আর তিমিশিকারে যেতে পারে না। কাছাকাছি সমুদ্রে আজকাল তিমি মেলে না এবং শিকারেও কড়াকড়ি আছে। তিমি শিকারে যেতে হলে সুদূর দক্ষিণে অ্যাণ্টার্কটিকার তুষার অঞ্চলে পাড়ি জমাতে হবে। অগত্যা সে মাছের কারবারে মন দিয়েছে।

রাজাকো বুড়োকে আমার খুব ভাল লাগছিল। আলাপী মানুষ। তিমিশিকারের মারাত্মক সব গল্প বলল। শেষে বলল, 'তুমি বুঝি বেড়াতে এসেছ এদেশে ?'

বললাম, 'হ্যাঁ। কতকটা তাই তবে...'

আমাকে হঠাৎ থামতে দেখে রাজাকো বলল, 'ব্যবসা-ট্যবসা করারও ইচ্ছে আছে বুঝি? সে তো ভালই। তোমার মতো জোয়ান ছেলের কি শুধু টো টো করে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ালে চলে? এই দেখ না! আমার যদি তোমার মতো একটা ছেলে থাকত, তাকে আমি এক্ষুনি আমার মাছধরা জাহাজে চাপিয়ে দক্ষিণ সাগরে তিমি মারতে পাঠাতাম। একটা ছোটখাট তিমি মারতে পারলেই রাজা। প্রচুর চর্বি আর হাড় বেচে একদিনেই সে ধনী হয়ে যেত।'

রাজাকোর বেশি কথা বলার বাতিক আছে। বললাম, 'না না। ব্যবসা আমার পোষাবে না। আমি এসেছি সরকারের একটা কাজে।'

রাজাকো ভড়কে গিয়ে বলল, 'ওরে বাবা! তুমি সরকারী লোক? তা হলে তো তোমার সঙ্গে আমার বনবে না। সরকারী লোকেরা বড্ড বাজে।'

বলেই সে উঠে দাঁড়াল। তারপর হনহন করে চলতে শুরু করল। অদ্ভুত বেয়াড়া লোক তো!

সন্ধ্যার ধূসরতা ঘনিয়েছে ততক্ষণে। একটু-একটু শীত করছে। প্রবাল-পাঁচিল ঘিরে কুয়াশা জমে উঠেছে। নারকেল বনটার পাশ দিয়ে রাজাকো হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, ওর ভুলটা ভাঙিয়ে দেওয়া দরকার।

কিন্তু কয়েক পা এগোতেই একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল। নারকেল বনের ভেতর থেকে দুটো লোক এসে রাজাকোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর দেখলাম রাজাকো পড়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম মাতৃভাষায় 'এই! এই! খবর্দার!'

লোক দুটো আমাকে দেখামাত্র নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে পালিয়ে গেল। দৌড়ে রাজাকোর কাছে গিয়ে দেখি, সে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। তাকে চিত করে দিতেই আমার সারা শরীর আতঙ্কে হিম হয়ে গেল। তার পেটে ছোরা মেরেছে আততায়ীরা। রক্তে জামাপ্যান্ট ভেসে যাচ্ছে।

বীচ এখন একেবারে জনহীন। আমার সবচেয়ে আতঙ্ক হল এই ভেবে যে, এখন এ অবস্থায় আমাকে কেউ দেখলে আমাকেই খুনী ঠাওরাবে। পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে হবে। অতএব এখনই কেটে পড়া দরকার। বরং হোটেলে গিয়ে ম্যানেজারকে খবর দেওয়া ভাল যে বীচে একটা রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর ওরা যা হয় করবে।

উঠে দাঁড়িয়েছি, সেই সময় রাজাকো ঘড়ঘড়ে গলায় অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, 'কান্তি! কান্তি!' তারপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওর শরীরটা স্থির হয়ে গেল।

কী বলল কে জানে! 'কান্তি' কী? আমি আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালাম না। এমন হতে পারে, ওর দুই খুনীই এতক্ষণে খবর দিয়েছে যে একজন বিদেশী টাকা ছিনতাইয়ের লোভে রাজাকোকে খুন করেছে!

আমি পা বাড়াতেই শক্ত কিছুতে পা পড়ল। দেখি রাজাকোবুড়োর সেই নীল টুপিটা ছিটকে পড়ে রয়েছে। কিন্তু টুপিটা এত শক্ত ঠেকল কেন? হেঁট হয়ে টুপিটা তুলে নিলাম। তারপর অবাক হয়ে গেলাম। এতটুকু একটা টুপির ওজন এত! নিশ্চয় এর ভেতর কোনো ভারি ধাতব জিনিস আছে।

টুপিটা সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম। তারপর অনেকটা ঘুরে বীচ এলাকা পেরিয়ে হোটেলে পৌঁছলাম। রিসেপশানের ইন্দোনেশীয় মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, 'কেমন লাগল আমাদের মিস রুবিকে?'

সে এই রুবি দ্বীপের প্রশংসা শুনতে চাইছিল। কিন্তু এ অবস্থায় হাসিতামাসা করা অসম্ভব। বললাম, 'দেখুন, এইমাত্র বীচ থেকে আসছি। বীচে একটা লোক পড়ে আছে দেখলাম। ডাকলাম সাড়া দিল না। অন্ধকারে কিছু বোঝা গেল না। মনে হলো '

'নিশ্চয় কোনো মাতাল ট্যুরিস্ট।'

'তবু একটু খোঁজ নেওয়া দরকার নয় কি?'

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি ভাববেন না মিস্টার! বীচে এমন মাতাল পড়ে থাকা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। আমাদের গা সওয়া। লোকটা যদি ট্যুরিস্ট না হয় তা হলে নিশ্চয় কোনো নাবিক। নাবিক যদি হয়, তা হলে আগামী কাল সূর্য ওঠার আগে ওর নেশা কাটবে না। ওকে ওঠানোও যাবে না।'

আমার বিবেকে বাধছিল। বললাম, 'বরং পুলিশে খবর দিন না মিস...'

'আমার নাম তোতিলাবতী ত্রিসত্যজায়া।'

'এ যে ভারতীয় নাম!'

'ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে আপনাদের সংস্কৃত ভাষার ছড়াছড়ি মিস্টার...'

'আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরী।'

'মিঃ চৌড্রি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

অদ্ভুত ব্যাপার তো! তোতিলাবতী ধরেই নিয়েছে আমি একটা বেহুঁশ মাতালকে দেখেছি। অগত্যা আর না বলে পারলাম না। 'মিস তোতিলাবতী...'

এ তো দেখছি কান্তি।

'আমায় তোতি বলে ডাকলে খুশি হব।'

মিস তোতি! লোকটার গায়ে রক্ত আছে মনে হলো। ওকে কেউ ছুরি মেরেছে!

তোতি এবার চোখ বড় করে বলল, 'তাই বুঝি! তা হলে তো আগে কাউকে দেখতে পাঠাতে হয়। তা না হলে পুলিশে খবর দিয়ে ঝামেলা হবে।' বলে সে হোটেলের একজন লোককে ডেকে নিজের ভাষায় কিছু বলল। লোকটা আর একজনকে ডেকে নিয়ে টর্চ হাতে বেরিয়ে গেল।

ওপরে আমাদের ঘরে এসে টুপিটা বের করলাম। তারপর একটা ব্লেড দিয়ে চিরতেই বেরিয়ে পড়ল এক-টুকরো শ্যাঁতলাধরা তামার ফলক। ফলকটা চাপরাসের মতো গোলাকার। তার ওপর আঁকাবাঁকা আঁচড় কেটে দুর্বোধ্য অক্ষরে কী সব লেখা রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আকৃষ্ট করল ফলকের ঠিক মাঝখানে একটা অদ্ভুত গড়নের গাছ। গাছটার ডালে-ডালে ইংরেজিতে এ বি সি ডি এইসব অক্ষর আঁকা।

মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিলাম না। কতক্ষণ পরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তারপর কর্নেল ও ব্যুগেনভিলি ফিরলেন। ঘরে ঢুকে কর্নেল বললেন, 'বীচে একটা রক্তাক্ত লাশ পেয়েছে পুলিশ। জয়ন্তকে আমি বলেছিলাম দ্বীপটা নিরাপদ। কথাটা খাটল না দেখছি।' বলেই কর্নেলের চোখ পড়ল আমার হাতের ফলকটার দিকে। শ্বাসরুদ্ধ গলায় বললেন, 'এ তো দেখছি কান্তি! কান্তি তুমি কোথায় পেলে জয়ন্ত?'

ব্যুগেনভিলিও লাফিয়ে উঠলেন। 'কী আশ্চর্য! এ যে দেখছি একটা কান্তি!' (ক্রমশঃ)

·চলন্ত পাদুকা·

·উজ্জ্বল ধর·

রাতের প্রাণীরা কি করে দেখে ?

অরূপরতন ভট্টাচার্য

যে সব প্রাণী সচরাচর রাতে চলাফেরা করে, তাদের বলা হয় নিশাচর প্রাণী। আমরা রাতে ঘুমোই, সারাদিন কাজে-কর্মে কাটে। কোন্ ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পরে রাতের খাওয়া সেরে নেওয়ার আগে ক'জন আর ঘুমিয়ে পড়ার সুযোগ পায় ? দিদিমা ঠাকুমার কথা অবশ্য আলাদা। তাঁরা দুপুরবেলা খাওয়ার পরে রামায়ণ মহাভারতের পাতায় চোখ রেখে পান চিবোতে চিবোতে ঠিক দু চোখের পাতা একটু বুজোবেন। কিন্তু আর কেউ ?

জঙ্গলের জীবজন্তু সম্পর্কে আমরা ভাবি অন্য রকমের। রাত যত গভীর হয়, ততই তাদের যেন দিন শুরু হয়। জঙ্গলের প্রাণীরা রাতে জাগে, দিনে তাদের ঘুমোনোর সময় এই আমাদের ধারণা। কিন্তু সব জীবজন্তু নিশাচর নয়। রাতের বেলাতে সবাই যে সরব আর সজীব থাকে এমনটি বলা যায় না।

নিশাচর প্রাণীদের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে চেনাজানা হচ্ছে ইঁদুর। ইঁদুর একটি মেরুদণ্ডী প্রাণী। এরকম আরও অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম করা যায়, বাদুড়, শেয়াল হায়না, সিংহ। কিন্তু শুধু মেরুদণ্ড আছে এমন প্রাণী নয়, মেরুদণ্ড নেই এমন নিশাচর প্রাণীর সংখ্যা কম নয়। কতরকমের পোকামাকড়, সরীসৃপ আর পতঙ্গ যে রাতকে দিন করছে, কে তা বলবে ? মশা তো উড়তে শুরু করে দিনের আলো কমে আসার পরেই ! কলকাতা শহর সম্পর্কে সেই প্রচলিত ছড়াটির কথা কে ভোলে ?

রাতে মশা দিনে মাছি
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।

মশার মত আছে মথেরাও। তা ছাড়া শামুকেরাও বেরিয়ে আসে রাতের বেলায় !

এই সব নিশাচর প্রাণীদের সম্পর্কে খোঁজখবর করা সহজ কাজ নয়। এ তো শুধু হঠাৎ দেখা বা হঠাৎ পাওয়া নয়, নিশাচর একটা প্রাণীকে জানতে গেলে বা বুঝতে গেলে অনেক সময় দেওয়া দরকার। রাতে কি তার সুবিধে থাকে ? সেইজন্যে দিনের আলোয় চলাফেরা করে বেড়ায় যে সব প্রাণীরা, তাদের সম্পর্কে যত খবর সংগ্রহ করতে পারেন বিজ্ঞানীরা, রাতের প্রাণী সম্পর্কে ততটা নয়।

তবু বিজ্ঞানীরা রাতের প্রাণী সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

রাতের প্রাণী সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কৌতূহল, এরা দেখতে পায় কি করে ? এরা শিকারের সন্ধান পায় কিভাবে ?

বাদুড়ের দৃষ্টিশক্তি আছে। কিন্তু সে দৃষ্টিশক্তি কিছুটা দুর্বল। ফলে রাতের অন্ধকারে দেখার কাজে সে দৃষ্টিশক্তি অনেকটা ব্যবহার করে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তা হলে সে পথ চলে কেমন করে ? অন্ধকারে চোখের দেখা যদি ঠিকমতো না হয়, তা হলে আমাদের বুদ্ধি বলে, পথ চলা মুশকিল। অথচ বাদুড় তো কোথাও ধাক্কা খায় না। সে এগিয়ে যাচ্ছে হাওয়ায় ডানা মেলে দিয়ে। শিকার ধরে ফেলে একটুও ফসকে না গিয়ে।

রাতে বাদুড় চলে এক অভিনব উপায়ে। তা শুনলে অবাক না হয়ে উপায় নেই। সমুদ্রের গভীরে কোথাও

বাদুড়

ডুবো জাহাজ আছে কিনা বোঝাটা তো সহজ কথা নয়। কিন্তু বিজ্ঞান আজ এতদূর এগিয়ে গেছে যে, জলের গভীরে কোথায় ডুবো জাহাজ ঘুরে বেড়াচ্ছে, সহজেই তা ধরা পড়ে। ডুবো জাহাজকে খুঁজে বের করার সময়ে যে কৌশলকে কাজে লাগানো হয়, রাতের বাদুড় চলে সেইরকম একটা উপায়ের উপর ভর করে। ব্যাপারটায় আছে ধ্বনি আর সেই সঙ্গে প্রতিধ্বনি। ডুবো জাহাজের বেলায় কাজে লাগানো হয় রেডিওতরঙ্গকে আর বাদুড়ে শব্দের তরঙ্গ প্রকৃতি কি অদ্ভুতভাবে বাদুড়কে পথ চলায় সাহায্য করেছে। বাদুড় এমন এক তীক্ষ্ণ শব্দ তৈরী করে সচরাচর যা আমরা শুনতে পাই না। এই কথাটায় নিশ্চয়ই কেউ কেউ একটু অবাক হবে। এমন শব্দ কি সত্যিই তৈরী করা সম্ভব,

যা আমরা শুনতে পাই না।

হ্যাঁ, তা সম্ভব আর এতে অবাক হওয়ার মত কিছু নেই।

এই যে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির সাহায্য নিয়ে পথ চলা, এতে বাদুড়ের শরীরের যে অঙ্গটি সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে তা হলো তার কান। বাদুড়ের এই কান দুটি অত্যন্ত সজাগ আর সচেতন। বাদুড় যে শব্দ ছাড়ে তা দেওয়ালে, গাছে বা পতঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে তার নিজের কানে। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির সময়ের ব্যবধান থেকে বাদুড় বুঝতে পারে তার শিকার থেকে সে কতদূরে বা পথ চলতে সে কোথায় বাধা পাচ্ছে।

বাদুড় ছাড়া এমন অনেক নিশাচর প্রাণী আছে যাদের চোখ রাত্তিরে দেখার উপযোগী। রাত্রে বেড়াল খুব ভাল দেখতে পায়, প্যাঁচাও। কিন্তু তারা ভালো দেখে কেমন করে ?

আমাদের চোখের মধ্যে আছে অক্ষিপট, তাকে ইংরেজিতে বলে রেটিনা। এটি আছে চোখের একেবারে ভেতরে, আলোয় এই অক্ষিপট সাড়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে খবর যায়। সেই খবরেই চোখ যা দেখছে তা ধরা পড়ে। অক্ষিপটের কিছু স্নায়ুকোষের নাম 'রড' আর কিছুর নাম 'কোন'। কোনের কাজ উজ্জ্বল আলোয়। সে ধরে দেবে রঙিন ছবিকে।

যে ছবি, না, শুধু বইয়ের ছবি নয়, যে চলমান ছবি প্রতি মুহূর্তে চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে তার সম্পর্কে খবর দেবে এই 'কোন'। রড কিন্তু মৃদু আলোতে সাড়া দেয়। অবশ্য 'কোন' সেরকম নয়। ফলে যে সব জীব-জন্তুর রাত্রে দৃষ্টি চলে ভাল, অন্যান্য জন্তুর সঙ্গে তুলনায় তাদের 'রড' কোষের সংখ্যা বেশি। রাত্রে দেখার জন্যে এদের ভূমিকাটা খুবই বড়।

গ্রামাঞ্চলের বা শহরতলীর খোলামেলা জায়গায় চাঁদ যখন আকাশে থাকে তখন সেই চাঁদের আলোতেই নিশাচর প্রাণীরা দেখতে পায়।

দেখার কৌশল এক এক প্রাণীর এক এক রকমের।

বেড়ালের বেলায় অক্ষিপটের ঠিক পেছনে আর একটা পর্দা থাকে। অক্ষিপটে যে যে আলোর শোষণ হয় না, তা গিয়ে পড়ে ওই পর্দার উপরে। সেখানে প্রতিফলিত হয় সে আলো ! চলে আসে আবার অক্ষিপটে। ওই পটে তার আবার নতুন ব্যবহার। বেড়াল যে রাতে ভাল দেখতে পায়, তার কারণ, যেটুকু আলো ওই পর্দায় গিয়ে পড়ে, তার অপচয় নেই, তাকে ঠিকমতো কাজে লাগানো হয়।

বেড়ালের মত প্যাঁচাও রাত্রিতে চমৎকার দেখে। প্যাঁচার চোখে আছে বড় স্নায়ুকোষ—যে কোষগুলির জন্যে অল্প

প্যাঁচা

আলোয় ভালো দেখা সম্ভব। কিন্তু শিকার ধরায় বাদুড়ের মত, এদের বেলায়, দেখার চেয়ে শোনার ভূমিকাটাই বড়। প্যাঁচার মাথার দুদিকে দুটো কান। মাথাটা বড় বলে দুটো কানের মধ্যের দূরত্ব অধিকাংশ পাখির তুলনায় বেশি। ফলে শিকার থেকে দুটো কানের দূরত্ব হেরফের করা যায়। সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করলে বলা যায়, দুই কান থেকে শিকারের দূরত্ব আলাদা হলে শব্দ এসে পৌঁছানোর সময়েরও তফাৎ হবে। ব্যাপারটা এতই সামান্য যে আমরা বুঝি সাধ্যি কি ? কিন্তু অদ্ভুত শ্রবণশক্তি প্যাঁচার। সে এই পার্থক্য থেকে ঠিক বুঝে নিতে পারে, কোথায় শিকার। ফলে শিকার সহজে ধরা পড়ে।

রাতের প্রাণীদের শিকার ধরার কত যে কৌশল তা বলে শেষ করা যায় না।

103E কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-29

সহজ কথায় রসায়ন : [আট]

রসাল রসায়ন

অমরনাথ রায়

আমাদের ছেলেবেলায় স্কুলে ভৌত ও জীবন বিজ্ঞান আলাদা আলাদাভাবে পড়ানো হত না। এখন যেমন দশটি বছর স্কুলে পড়ার পর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে হয়, আমাদের সময় দশ বছরের শিক্ষান্তে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে হত। সে পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেই স্কুলের পড়া শেষ হত। উচ্চ শিক্ষার জন্যে, তার মানে আই. এ. বা আই. এস. সি. পড়বার জন্যে ঢুকতে হত কলেজে। একালের মতো দু'বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা তখন চালু ছিল না, চালু ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা।

সেকালে স্কুলে আমাদের একটিমাত্র বিজ্ঞান বই পড়তে হত। তাতেই বিভিন্ন অধ্যায়ে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে মূল তত্ত্বগুলি পড়তে হত। কাজেই বিজ্ঞান পড়ার চাপটা স্কুল পর্যায়ে একালের চাইতে সেকালে অনেক কমই ছিল বলা যায়। এ ভিন্ন আরও একটা ব্যাপারে আমরা সৌভাগ্যবান ছিলাম বলতে হয়। সেটা হলো—কি স্কুল আর কি কলেজ, যেখানেই বিজ্ঞান পড়েছি, সেখানেই অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ক্লাশের মধ্যেই দেখবার সুযোগ পেয়েছি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখলে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি বোঝা সহজতর হয়, আর মনেও থাকে দীর্ঘকাল। শিক্ষা বিষয়ক মনস্তত্ত্বেও সেই কথা বলে। শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে যত বেশি ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করা যায়, শিক্ষাটা ততই পাকাপোক্ত হয়। জোরে চেঁচিয়ে পড়া অর্থাৎ কিনা সরব পাঠ, মনে মনে পড়ার চেয়ে ভাল। তার কারণ সেক্ষেত্রে দর্শন ও শ্রবণ দু'টি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয়। নীরব পাঠের ক্ষেত্রে কেবল দর্শনেন্দ্রিয়েরই ব্যবহার হয়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয় না। সরব পাঠের পর পড়া জিনিসটাকে খাতায় লেখাও ভাল অভ্যাস। সেক্ষেত্রে তিনটি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের ফলে শেখাটা আরও ভাল হয়। আর শিক্ষক মশাই পড়ানোর সময় যদি ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি এঁকে এবং মডেল ও চার্ট দেখিয়ে বা এক্সপেরিমেণ্ট দেখিয়ে পাঠ্য-বিষয় ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝান কিংবা ছাত্র-ছাত্রীরা যদি নিজেরাই হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখে তা হলে তো আরও ভাল। চোখে দেখা বা নিজের হাতে করা এক্সপেরিমেণ্ট মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে যায়। ফলে তা মনে থাকে দীর্ঘকাল, শেখাটা হয় ভাল।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই। সেটা হলো বিজ্ঞান বইতে এমন অনেক জিনিস তোমরা পড়, যার সত্যাসত্য বাড়িতে বসে এক্সপেরিমেণ্ট ক'রে নিজেরাই যাচাই ক'রে নিতে পার। যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম লাগে সামান্যই। রসায়ন বিজ্ঞানের এমন কয়েকটি সহজ পরীক্ষার কথা এখন তোমাদের বলব।

বেশ বড়সড় একটা কাচের বাটি নাও। তাতে আধ বাটি ঠাণ্ডা জল ঢাল। এইবার একটুকরো সোডিয়াম ধাতু ঐ বাটির জলে ফেলে দাও। দেখবে যে, জলের সংস্পর্শে আসা মাত্রই সোডিয়ামের টুকরোটিতে আগুন ধরে গেছে এবং সেটি প্রবল বেগে বাটির জলের মধ্যে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। এক্ষেত্রে জলের সংস্পর্শে সোডিয়াম মৌলটি আসায় উভয়ের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং তার ফলে উৎপন্ন হয় হাইড্রোজেন গ্যাস ও 'সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড' নামক ক্ষার পদার্থ। এই সহজ পরীক্ষাটির মধ্যে দিয়ে তোমরা যাচাই ক'রে নিতে পারবে যে, সংস্পর্শের দ্বারা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

'ঊর্ধ্বপাতন' কথাটির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে। তোমরা জান যে, কর্পূর, ন্যাপথ্যালিন প্রভৃতি এমন কয়েকটি কঠিন পদার্থ আছে, উত্তাপের প্রভাবে যারা তরলে পরিণত না হ'য়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়। আবার সেই বাষ্পকে শীতল করলে তা তরল না হ'য়ে সরাসরি পূর্বের কঠিন রূপ লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার নামই 'ঊর্ধ্বপাতন'।

বাড়িতে বসে অতি সহজে তোমরা এই পরীক্ষাটি করতে পার। উপকরণ লাগবে সামান্যই।

পোরসিলিনের একটি বেসিন, একটা কাচের ফানেল আর কিছু কর্পূর বা ন্যাপথ্যালিন চূর্ণ নাও। বেসিনে কর্পূর বা ন্যাপথ্যালিন চূর্ণ রেখে তার ওপর ফানেলটি উপুড় ক'রে দাও। ফানেলের খোলা মুখটি তুলো দিয়ে বন্ধ করে দাও। তা হলে কর্পূর বা ন্যাপথ্যালিনের বাষ্প বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবে না। তারপর স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্য বেসিনটিকে গরম কর। কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে যে, কর্পূর বা ন্যাপথ্যালিনের বাষ্প ফানেলের মধ্যে জমছে। এইবার ঠাণ্ডা জলে ফিল্টার কাগজ ভিজিয়ে ফানেলটার গায়ে জড়িয়ে দাও। ফানেলের গা তাতে

ঠাণ্ডা হবে আর সেই শীতলতায় ফানেলের মধ্যেকার বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে কঠিনে পরিণত হ'য়ে ফানেলের ভেতর দিকের গায়ে জমতে থাকবে। ঘনীভবন শেষ হবার পর ছুরি দিয়ে ফানেলের ভেতর থেকে কঠিন ন্যাপথ্যালিন বা কর্পূরকে চেঁচে একটা কাগজে ঢেলে নাও। যতটা কর্পূর বা ন্যাপথ্যালিন তুমি পরীক্ষার শুরুতে নিয়েছিল, ঠিক ততটাই পরীক্ষা শেষে ফিরে পাবে। ভারী মজার ব্যাপার নয় কি?

এবারে আর একটা পরীক্ষার কথা বলে শেষ করব। কাচের একটা গ্লাসে স্বচ্ছ চুন জল ঢালো। তারপর সরবৎ খাবার জন্যে যে 'স্ট্র-নল' ব্যবহার করা হয় তারই সাহায্যে ঐ চুন জলে ফুঁ দিতে থাক। কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে যে, গেলাসের স্বচ্ছ চুন জল ঘোলা হয়ে গেছে। কিন্তু কেন এমন হলো তা বলতে পার কি?

ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। তোমরা তো জানই যে, আমাদের নিঃশ্বাস বায়ুর সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে আসে। ফুঁ দিলে ঐ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস গেলাসের মধ্যেকার স্বচ্ছ চুন জলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায় এবং তার ফলে উৎপন্ন হয় খড়িমাটি বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট-এর সূক্ষ্ম গুঁড়ো। খড়িমাটির গুঁড়ো সাদা এবং চুন-জলে অদ্রাব্য। তাই এক্ষেত্রে স্বচ্ছ চুন-জল ঘোলা হয়ে যায়।

এই পরীক্ষাগুলো বাড়িতে বা স্কুলের ল্যাবরেটরীতে করলে তোমরা যথেষ্ট আনন্দ পাবে এবং সেই সঙ্গে রসায়নও ভালভাবে শিখতে পারবে।

শরীর, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা

একাধারে খাদ্য ও পানীয় ● হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমি নারিকেলের কথা বলছি—যেটি একাধারে খাদ্য ও পানীয়। এ ফলটি সত্যিই এক আশ্চর্য সৃষ্টি। এর জল আনে তৃপ্তি এবং এর সুস্বাদু শাঁস খেলে ক্ষুধা মরে ও শরীরের শক্তি বাড়ে।

এ ফলের কাঁচা অবস্থার নাম ডাব। ডাব অবস্থায় এর ফলে শুধুই জল থাকে, খাদ্যের সংস্থান থাকে না। সব ভোজ্য ফলই যখন পাকে তখন তার খাদ্যমাত্রা বাড়ে, স্বাদও বাড়ে। ডাব যখন পেকে নারকেলে পরিণত হয় তখন তার মধ্যে খাদ্যাংশ তৈরি হয়। প্রকৃতির সৃষ্টিও বিচিত্র, মানুষের মতিগতিও কম বিচিত্র নয়। ডাবের অল্প পরিমাণ স্বাদু জলের লোভে ডাবকে নারিকেলে পরিণত হতে দেওয়া হয় না। যেখানে আমরা ভাল খাদ্য পেতে পারি সেখানে শুধু জলের লোভে সেটুকু থেকে নিজেদের বঞ্চিত করি।

হোক, যাঁরা এইভাবে ডাব খান তাঁদের-কাছে আমি প্রশ্ন রাখছি যে, ডাবের জল পান করে একটা তাৎক্ষণিক তৃপ্তি ছাড়া আর কী উপকার পান সেটা তাঁরা যেন নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখেন। ডাবের জল, নরম শাঁস এবং নারকেলের গুণাগুণের একটা তুলনামূলক তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

নিচের তালিকা দেখলে জল ও শাঁসের খাদ্যগুণের কতটা তফাৎ তা সহজেই বোঝা যায়। বস্তুত নারকেলের শাঁস একটি সহজলভ্য, পুষ্টিকর অথচ সুস্বাদু খাদ্য। কাঁচা খাওয়া যায়, ভেজে খাওয়া যায়, তরকারির সঙ্গে রেঁধে খাওয়া যায়। গুড় দিয়ে নাড়ু তৈরি করে মুড়ির সঙ্গে খেলে খুব ভাল জলপানের ব্যবস্থা হতে পারে।

পেটের অসুখে এটি উপকারী পানীয়। ডাবের জলে কিছু পটাসিয়াম থাকায় যে সব রোগীকে অধিক

আউন্স প্রতি মিলিগ্রাম

	প্রোটিন	ফ্যাট	খাতব লবণ	শর্করা	ক্যাল-সিয়াম	ফসফরাস	লৌহ	ভিটা-বি	নিকোটি-নিক অ্যাঃ	রিবো-ফ্লেভিন	ভিটা-সি	ক্যালোরি
ডাবের জল	<0·1	<0·1	0·1	1·1	6	<3	<0·1	<3				5
কচি শাঁস	0·3	0 4	0·2	1·8	3	8	0·3				1	11
নারিকেল	1·4	11·8	0·3	3·7	3	68	0·5	4	0·2	28		126

ডাবের জল যে লোকে পান করে সে যে শুধু তৃপ্তির জন্যে তা নয়। ডাবের জলের আনুমানিক উপকারিতার মোহেই পান করা হয়। ডাবের জলের যেসব উপকারিতা আছে বলে মনে করা হয় তা কিন্তু তথ্যনির্ভর ও বিজ্ঞানসম্মত নয় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় তা প্রমাণিত হয় না। সে যাই প্রস্রাব করানোর ওষুধ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ডাবের জলে সুফল পাওয়া যায়। রাস্তাঘাটে তেষ্টা পেলে বিশুদ্ধ জল হিসাবে ডাবই সবচেয়ে নিরাপদ।

25 A, নিমতলাঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-6

উইলিয়াম হার্ভে

প্রদীপকুমার দাস

উইলিয়াম হার্ভে। বিশ্ববিশ্রুত নাম। রক্তসংবহনের আবিষ্কারক। জন্মস্থান কেন্টের ফ্রকস্টোথ। ইংরেজি 1578 সালের পয়লা এপ্রিল। কেম্ব্রিজের কেয়াস কলেজের পাঠ শেষ করে পাদুয়া পাড়ি দেন উচ্চশিক্ষার জন্যে। 1602 সালে ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। রয়াল কলেজের সদস্য নির্বাচিত হন 1609 সালে। 1616 খ্রীষ্টাব্দে কলেজ অব ফিজিসিয়ানসে 'হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও রক্তের সংবহন' সম্বন্ধীয় তাঁর নিজস্ব ধারণাটি ব্যক্ত করেন। 1628 সালে রক্তের সংবহন বিষয়ক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। তাঁর আগে শারীরতত্ত্ববিদদের রক্তের সংবহন সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। দার্শনিক অ্যারিস্টটলের ধারণা ছিল, রক্তের সৃষ্টি খাদ্য থেকে। যকৃতই ছিল রক্ত তৈরীর কারখানা। রক্ত যকৃত থেকে তৈরী হয়ে হৃৎপিণ্ডে আসত, সেখান থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ত শিরার মাধ্যমে। গ্রীকসম্রাট আলেক জাণ্ডারের চিকিৎসক ইরাসিস্ট্রাটাস ও হিরোফিলাসের মতে রক্ত শিরার মাধ্যমে সংবাহিত হয়। ধমনীগুলিতে কিছুটা পরিমাণ বাতাস বা শক্তি (Spirit) থাকে। তাঁরা এজন্যই ধমনীর নাম দেন বাতাসবাহিকা নালী। গ্যালেন বিশ্বাস করতেন না ধমনীকে শুধুমাত্র বাতাস-বাহিকা নালী হিসাবে। তিনি মনে করতেন এই ধমনীতে বাতাস বা শক্তি ছাড়াও রক্ত থাকে। এই রক্তের সঞ্চালনের জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন হয় সেটা আসে মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুমণ্ডলীর মাধ্যমে। গ্যালেনের মতবাদই সত্য বলে স্বীকৃতি লাভ করে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত। তাঁদের ধারণায় হৃৎপিণ্ডের দুটি নিলয়ের মধ্যেকার প্রাচীরটি ভেদ্য। সে-কারণে রক্তের সহমিশ্রণ সম্ভবপর ছিল। হৃৎপিণ্ডের কার্য ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁদের সঠিক কোন ধারণা ছিল না।

ষষ্ঠাদশ শতাব্দীর অন্যতম শারীরতত্ত্ববিদ অ্যাণ্ড্রেজ ভিসেলিয়াস 1543 খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করেন, অলিন্দ-নিলয়ের মধ্যেকার প্রাচীরটি সম্পূর্ণ ও ভেদ্য। তাঁরও মতে দুই নিলয়ে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটত। 1553 সালে মাইকেল সারভেটাস নামে একজন শারীরবিদ ঘোষণা করেন হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে পালমোনারী ধমনী ও পালমোনারী শিরা। রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে আসে পালমোনারী ধমনীর মাধ্যমে। পরে রক্ত ফুসফুস থেকে পালমোনারী শিরায় বাহিত হয়ে হৃ পিণ্ডে ফিরে আসে। এই সময় হার্ভের শিক্ষক ফেবরিসিয়াস আবিষ্কার করেন শিরার মধ্যে ভ্যালভ্ বা কপাটিকার অস্তিত্ব।

উইলিয়ম হার্ভে

এরপরেই উইলিয়াম হার্ভে রক্তের সংবহন সম্বন্ধীয় সুস্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করেন। তাঁর মতেহৃৎপিণ্ডটি একটি পেশীর থলি। এই পেশীর ক্রমাগত সংকোচন ও প্রসারণই রক্তের গতির উৎস। পেশীর সংকোচনে রক্ত মহাধমনীতে নিক্ষিপ্ত হয়। নাড়ীর স্পন্দন ও হৃৎপেশীর সংকোচন যুগপৎ ঘটে। নাড়ীর স্পন্দন সৃষ্টি হয় রক্ত ধমনীতে চলাচলের জন্যে। তাঁর মতে হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে দুই নিলয়ের মধ্যেকার পর্দাটি ছিদ্রযুক্ত নয়। তাই রক্তের সহমিশ্রণ হওয়া সম্ভব নয়। দক্ষিণ নিলয় থেকে রক্ত ফুসফুসে ও পালমোনারী শিরায় বাহিত হয়ে বাম-নিলয়ে প্রবেশ করে, সেখান থেকে হৃৎপেশীর সংকোচনে মহাধমনী ও অন্যান্য ধমনীতে ছড়িয়ে পড়ে। পরে আবার শিরা-উপশিরার মাধ্যমে দক্ষিণ নিলয়ে জমা হয় ও চক্রাকারে শিরা ও ধমনীতে একই রক্ত আবর্তিত হয়। তাঁর বক্তব্য শিরার মধ্যে রক্তের গতি পথ আঁকা-বাঁকা নয়। ঋজুগতিতে রক্ত দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে প্রবাহিত হয়। ঐ গতিপথের উৎসমুখ হলো হৃৎপিণ্ডই, যকৃত নয়। কালক্রমে উইলিয়াম হার্ভের মতবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হয় পশু, পাখী, মানুষের দেহে শব ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে। ক্রমেই দেশ-বিদেশের সমস্ত শারীরতত্ত্ববিদরা তাঁর 'রক্তের সংবহন' সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন এবং বিনা প্রতিবাদে মেনে নেন। ইউরোপের সমস্ত দেশ থেকে আসে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রশংসা-পত্র। 1654 খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্মানের সঙ্গে কলেজ অব ফিজিসিয়ানসের সভাপতি নির্বাচিত হন। 1657 সালের 3 জুন তাঁর তিরোধান ঘটে।

২০, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-9

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা জুন-'83 সংখ্যার যারা দশ বা তার বেশী প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে

কলকাতা

অজয়েশ ঘোষাল, রেহানা খাতুন, মনিরা বেগম, প্রণবকুমার সরকার, সুপর্ণা সরকার, ঝুমকি সরকার, অরুণ চ্যাটার্জী, মলয় দাস, সৌমেন পাল, সৌমেন মৈত্র, ইন্দ্রজিৎ সমাদ্দার, রাজীব নন্দী, সঞ্জয় কুণ্ডু, গৌতম দাস, গৌতম মাইতি, অভিজিৎ সাহা, তাপস হালদার।

24-পরগনা

তমাল ঘটক।

হাওড়া

শম্পা কুণ্ডু, গার্গী কুণ্ডু, পার্থসারথী কুণ্ডু, অমিতাভ মান্না।

হুগলী

অভিজিৎ দত্ত, মনোজিৎ দত্ত, যমুনা শীল, অনুসীমা শীল, কৌশিক দত্ত, শুভাশিস নন্দী, মঞ্জরী কুণ্ডু, আশিসকুমার সাহা।

বর্ধমান

সুব্রত ঘোষ, রবিব্রত ঘোষ, অতীন্দ্রনাথ মিশ্র, অমিতাভ হালদার, বুকুল ব্যানার্জী, প্রদীপ ব্যানার্জী, ভবানী রায়।

মেদিনীপুর

নমিতারাণী মাইতি, ননীগোপাল মণ্ডল, শিখারাণী মাজী, শ্রীমন্তকুমার সিং, বাদলকুমার মণ্ডল।

বীরভূম

বামদেব সরখেল, দেবদুলাল মাল, দীপনারায়ণ দত্ত, প্রিয়াঙ্কা দত্ত, মুনমুন সরকার, গোপা বিশ্বাস, প্রলয়কুমার বৈদ্য, বুবুনা বৈদ্য, বাপন রায়, বিদ্যুৎ রায়, প্রদ্যুৎ রায়, কাঞ্চন রায়, জীবেন্দু মজুমদার, শরৎ গড়াই, রবিউল ইসলাম, পার্থপ্রতিম দত্ত, মেহেবুব মজুমদার, প্রণতি মণ্ডল।

জলপাইগুড়ি

জয়জিৎ লাহিড়ী।

আসাম

ডিব্রুগড়ঃ শঙ্কর বল, দীপঙ্কর পাল, দেবাশীষ হালদার, রাহুল দাস, রজত দাস, অভিজিৎ ঘোষ, সুমন সেন, উজ্জ্বল দাস, পার্থ মুখার্জী।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত
রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাগুলি
পরবর্তী আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ছাপা হবে।

প্রশ্নোত্তর

1. প্রঃ বর্তমানে বিশ্বের পরিবেশের অবস্থা খুবই খারাপ। পরিবেশ দূষণে বিলুপ্ত হচ্ছে জীবকূল, নানা সমস্যায় পড়ছে মানবজাতি। জানতে ইচ্ছে করে, প্রধানত কি কি কারণে বর্তমানে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে?

সেখ ইকবাল আমেদ, গ্রাম-শ্রীরামপুর, পোস্ট-মহিষরেখা, জেলা-হাওড়া।

উঃ- বর্তমানে বিশ্বের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে প্রধানত বায়ু দূষণ, জল দূষণ ও পারমাণবিক বিস্ফোরণ জনিত দূষণের জন্যে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই শিল্পায়নের ফলে নানা বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস বায়ুতে মিশ্রিত হচ্ছে, নানা দূষিত রাসায়নিক পদার্থ জলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণও তাদের পরিত্যক্ত মলমূত্রাদি প্রচুর পরিমাণে জলের সঙ্গে মিশছে। এ ছাড়া মাঝে-মধ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে মারাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থ বায়ু বাহিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটিতেও মিশছে। প্রধানত এই কারণগুলির জন্যেই পরিবেশ আজ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

2. প্রঃ—মানুষ মারা যাবার পর তার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইচ্ছমাত নাড়াচাড়া করা যায় না কেন?

কমলকুমার দাস, 20A জয়কৃষ্ণ পাল রোড, কলি-38

উঃ—মৃত্যুর 2 থেকে 3 ঘণ্টার পরে শরীরের পেশী শক্ত হয়ে যায়, যার ফলে মৃতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহজে নাড়াচাড়া করা যায় না। এই ঘটনাকে বলে রাইগার মার্টিস। দেহের পেশীতন্তুর মধ্যে 'মায়োফাইব্রিল' নামে সংকোচনশীল অংশ থাকে, যা প্রোটিন দ্বারা গঠিত। জীবিত অবস্থায় এই প্রোটিন অংশগুলি স্নায়ুতরঙ্গের নির্দেশে সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয় এবং তার শক্তি জোগায় A T P. মানুষ মারা গেলে ATP-গুলি ক্রমাগত নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। ফলে সংশ্লিষ্ট অংশগুলি কঠিনভাবে যুক্ত হয়ে যায় এবং পেশীগুলি সংকোচন প্রসারণে অক্ষম হয়ে যায়।

3. প্রশ্ন ঃ— মাথা ধরে কেন?

রাজা হালদার, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া।

উঃ নানা ব্যাধিতেই মাথা ধরে। মুখ্য কারণ হলো মস্তিষ্কের করোটিক শিরার ভিতর অস্বাভাবিক রক্ত সংবহন। জীবাণুঘটিত জ্বর, দেহে জীবাণু থাকার জন্যে রক্তে বিষক্রিয়ার আধিক্য হলে মাথা ধরে। সাধারণত চোখ বা নাকের অসুখের দরুন প্রতিবর্ত হিসাবে মাথা ধরে। মানসিক উদ্বেগেও মাথা ধরে।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

অমরনাথ রায়

1. প্রকৃতিতে বোরনকে কি মৌলাবস্থায় পাওয়া যায়?

2. কাগজ জৈব না অজৈব পদার্থ?

3. কোকুন (Cocoon) কাকে বলে?

4. প্রজাপতি কি ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে?

5. উপপত্র কাকে বলে?

6. 'ট্যাকোমিটার' কি?

7. কোন্ পাখির ডানা দুর্বল?

8. 'ডেসিবেল' (decibel) কিসের একক?

9. কোন্ মৌলের প্রতীক W?

10. গুলতি টেনে রাখা হলো। ওতে কোন শক্তি থাকলো কি?

11. একটি তেজস্ক্রিয় ধাতুর পরমাণু ক্রমাংক 90, ঐ ধাতুটির নাম কি?

12. আর্মেচার কাকে বলে?

13. 'প্লার্স' কোন্ শ্রেণীর লিভার?

14. পশ্চিম গোলার্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ ও শক্তিশালী লড়াকু প্রাণীর নাম কি?

15. 'মরক্কো লেদার' কিসের চামড়া?

(সমাধান পরবর্তী সংখ্যায়)

(গত সংখ্যার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার সমাধান)

1. আরগন (A), বোরন (B), কার্বন (C)। 2. 30টি দাঁত থাকে। 3. সাপের চোখের পাতা নেই। 4. স্যার অ্যামব্রোস ফ্লেমিং। 5. রেড লেড। 6. ডালটনিজম্। 7. অস্ট্রেলিয়া দেশে। 8. মহারাষ্ট্র প্রদেশে। 9. ইলেকট্রাম। 10. Space Applicatien Centre 11. William Oughtred. 12. কনুইতে আলম্ব থাকে। 13. বাড়ে। 14. বেকিং পাউডার। 15. Thistle.

ভেবে ভেবে বল

বিমল চন্দ

1. নিচে একটি উদ্ভিদ ও একটি প্রাণীর ছবি আছে, এদের নাম কি ?

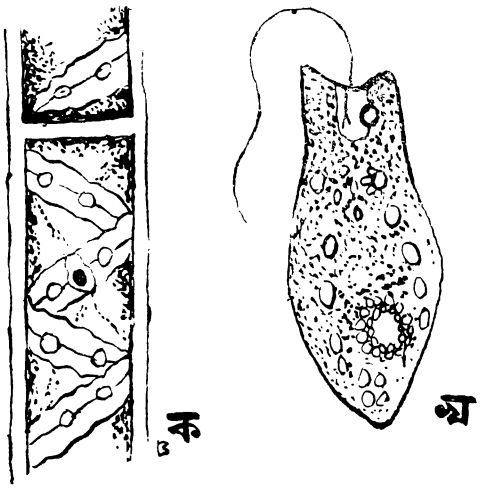

2. 'কলেরা' রোগের জীবাণুর নাম কি ?
3. পূর্ণাঙ্গ মানুষের দেহে হাড়ের সংখ্যা কত ?
4. 'কোবাল্ট' মৌলটির পরমাণু ক্রমাংক কত

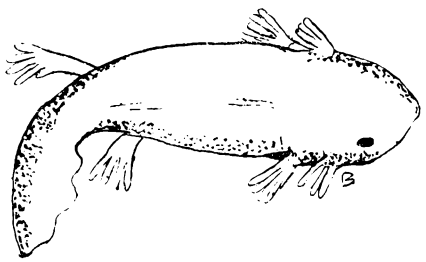

5. উপরে যে প্রাণীটির ছবি আছে, তার নাম কি ?
6. সূর্যের চারপাশে একপাক ঘুরতে 'মঙ্গল'গ্রহের লাগে প্রায়—(ক) 587 দিন, (খ) 642 দিন, (গ) 687 দিন।
7. গ্রামোফোন আবিষ্কার করেন কে ?
8. Rb চিহ্নটি কোন মৌলকে বুঝায় ?
(ক) রুবিডিয়াম, (খ) প্লাটিনাম, (গ) রেডিয়াম।
9. এক্স রশ্মি ও ক্যাথোড রশ্মির মধ্যে ভেদন ক্ষমতা কার বেশি ?
10. কোন্ বিজ্ঞানী ক্যাথোড রশ্মির প্রকৃতি নির্ধারণ করেন ? (ক) টমসন্, (খ) ফার্মার, (গ) কোল্ট।

নিজে কর

জলের নিচে আগ্নেয়গিরি

হিমাদ্রি আদিত্য চৌধুরী

কথাটা শুনতে অদ্ভুত হলেও কাজে সত্যি। এই আগ্নেয়গিরিতে আগুনের ভয় নেই, বিপদের ভয়ও নেই। এই আগ্নেয়গিরি তৈরী করতে গেলে আমাদের কয়েকটা জিনিষের দরকার—কালির দোয়াত, দুটো কর্নিং কাচের মোটা ও সরু টিউব, বোতল ও কালি। প্রথমে কালির দোয়াতের ছিপিতে দুটি ফুটো করে, এক মুখে (A_1) মোটা টিউব ও অপর (A_2) মুখে সামনের দিক ছুঁচলো সরু টিউবটি প্রবেশ করানো হলো। দোয়াতে রাখা হলো কালি মিশ্রিত গরম জল ও বোতলে রাখা হলো ঠাণ্ডা জল। তারপর বোতলের ঠাণ্ডা জলের মধ্যে প্রবেশ করানো হলো দোয়াত অর্থাৎ বোতলের নিচে রাখা হলো দোয়াত, এবার শুরু হলো মজা। দেখা যাবে, দোয়াতের সরু নল দিয়ে জেটের গতিতে বেরিয়ে আসছে কালি মিশ্রিত জল। নিচের ছবি দেখলে কিছুটা বোঝা যাবে।

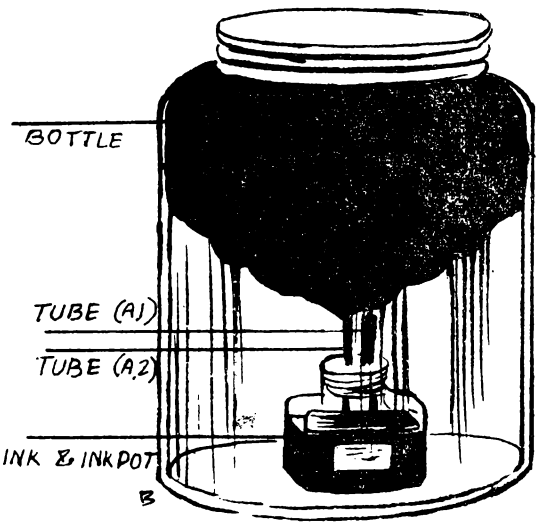

এই পরীক্ষার ব্যাখ্যা আরো সহজ। গরম জল ঠাণ্ডা জলের থেকে হাল্কা হওয়ায় তাড়াতাড়ি উপরে উঠছে আবার ঠাণ্ডা জল ভারী হওয়ায় নেমে যাচ্ছে। এই আগ্নেয়গিরি চলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দোয়াতের জলের তাপমাত্রা বোতলের তাপমাত্রার সমান হয়।

5/C এন এস এস, নদীয়া।

ভেবে ভেবে বল'র উত্তর

1. (ক) স্পাইরোগাইরা, (খ) ইউগ্লিনা, 2. ভিব্রিও কোমা। 3. 206টি, 4. 27, 5. এস্‌জোটেল লার্ভা, 6. 687 দিন, 7. টমাস আলভা এডিসন, 8. রুবিডিয়াম, 9. এক্স রশ্মির, 10. টমসন্।

পশ্চিম মাসুন্দা, পোঃ-নিউব্যারাকপুর, 24 পরগনা।

ডিল্টুর কেরামতি

সোমনাথ সেনগুপ্ত

ডিল্টু আমার নিকটতম বন্ধু। ওর এবং আমার মাথায় মাঝে মাঝে বিচিত্র বৈজ্ঞানিক চিন্তার উদয় হয়। এইগুলো আমাদের দাদাদের কাছে বেশ হাস্যকর বস্তু। বস্তুত ওর মাথায় আমার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তা সব সময় নীল আকাশের চিলের মত ঘুরপাক খায়। দু একবার মডেল তৈরীর জন্যে বাবা মার কাছে টাকা চেয়ে টাকার বদলে, 'ওর চেয়ে একটু পড়াশুনায় মন দাও' গোছের বেশ কিছু কথামৃত উপহার পেয়েছে। এই বছর ডিল্টু মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। অতঃপর সে বেশ চেষ্টা করে মোট 50 টাকা মাইনের টিউশনি যোগাড় করেছে। একদিন বেশ কৌশল করে বাবা-মার কাছ থেকে ঐ টাকা ইচ্ছামত খরচ করার মত আদায় করেছে। ব্যাস্, ডিল্টু'কে আর পায় কে? প্রথমবার মাইনে পাবার পরেই ও কাজ শুরু করে দিল।

ওদের বাড়ির একটা অব্যবহৃত ঘরকে বাসোপযোগী করে নিয়ে ও কাজ শুরু করল। ঘরের বাইরে বড় বড় করে 'TRESPASSERS WILL BE PROSECUTED' লেখা একটা কাগজ সেঁটে দিল। ঐ ঘরে সে আমাকেও ঢুকতে দিত না।

এরপর ও বাড়ি থেকে খুব একটা বের হত না, প্রায়ই খেলতে আসত না। বন্ধুরা ওর নাম দিয়েছিল বিজ্ঞানী। একথা ওকে বলতে ও বলেছিল, 'আজ ওরা বলছে কয়েক বছর বাদে বিশ্ববাসী বলবে।' এই কথা শুনে অন্যান্য বন্ধুরা বিশ্বকবির অনুকরণে ওকে 'বিশ্ব-বিজ্ঞানী' বলে ডাকতে শুরু করেছে। তাতেও ওর ভ্রুক্ষেপ নেই।

এরপর অনেকদিন হয়ে গেল। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলও বের হয়ে গেল। আমি স্থানীয় বারাসত সরকারী মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম, ও অন্যত্র ভর্তি হলো। তখনও কলেজ শুরু হয় নি। ও আমাকে একদিন ডেকে নিয়ে গেল। বললো, 'যন্ত্র শেষ'। শুনে আমি বেশ রোমাঞ্চিত হলাম।

যন্ত্রটা দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ! ওকে চালাতে বললাম। ও বলল, 'এখন নয়, সবাইকে খুব চমকে দেবার ইচ্ছে আছে।'

'মহৎ কাজ কখনও ব্যর্থ হয় না'। সুযোগ মিলে গেল। পাড়ার মিণ্টুদার বিয়ের বৌভাতে ডিল্টুদের সবার নিমন্ত্রণ। ঐদিন সন্ধ্যায় আবার পাড়ায় লোডশেডিং থাকে। পেট ব্যথার ছল করে ডিল্টু গেল না। ওর যাতে একা থাকতে কোনো 'অসুবিধা' না হয়, তাই আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। ওর বাবা-মা দাদা চলে যাবার পর ও আর আমি ওদের ছাদে গিয়ে বসলাম। তার আগে দুই-একটা প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিলাম।

ডিল্টুদের বাড়ির ছাদ থেকে মিণ্টুদার বাড়ির গেট দেখা যায়। ওর বাবা মা দাদা বের হবা-মাত্র ও নিচে গিয়ে চাবি দিয়ে যন্ত্রটা চালু করে দিল। তারপর কাচের বড় বড় দুটি একমুখ খোলা বাক্স দিয়ে যন্ত্রটা ঢেকে দিয়ে পাম্প করে ভেতরের হাওয়া বের করে ফেললো। অমনি যন্ত্রটার বিদ্‌ঘুটে আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল আর সুইচ্ টেপামাত্র বাড়ির কয়েকটা আলো জ্বলে উঠলো। ইতি-মধ্যে ডিল্টুর বাবা-মা-দাদা বাড়ি পৌঁছে আলো জ্বলতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় ডিল্টু দরজা খুলে বিজয়ীর ভঙ্গিতে এসে দাঁড়ালো। হতভম্ব বাবা-মা-দাদাকে নিয়ে ও সোজা চলে এলো ঐ 'Trespassers will be prosecuted' লেখা ঘরটায়। তারপর ও বলতে শুরু করলো

'হাতঘড়িতে একবার দম দিলে ঘণ্টার কাঁটা ঘড়ির ডায়ালটাকে পুরো দুবার পাক খেয়ে আসতে সময় নেয় 24 ঘণ্টা। ওটার গতিবেগ যদি 6 গুণ বৃদ্ধি করা যায় তবে ঘণ্টার কাঁটা পুরা ঘড়িটাকে পাক খেয়ে আসতে সময় নেবে 4 ঘণ্টা। এই ব্যাপারটার সাহায্যেই আমার জেনারেটারটা তৈরী করেছি। ঘড়িতে ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা যে কৌশলে বসানো থাকে ঠিক সেই কৌশল প্রয়োগ করে আমি ঘুটো ঘূর্ণায়মান দণ্ড পেয়েছি। তাদের প্রতিটার সঙ্গে আমি একটা করে জেনারেটার লাগিয়েছি। এখন দুটো জেনারেটার যে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করছে, তাকে কয়েকটা টুনি বাল্ব-এর বেশি কিছু জ্বালানো অসম্ভব। তাই আমি ইনডাকশন কয়েল (আবেশ কুণ্ডলি) ব্যবহার করে 220 ভোল্টের বিদ্যুৎ তৈরী করেছি। তাই বাড়ির আলো জ্বলছে। তবে এই যন্ত্র যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে তাতে মোট 400 ওয়াটের বেশি ক্ষমতার আলো জ্বালানো যাবে না।'

একটু থামামাত্র ওর দাদা প্রশ্ন করলো, 'বাইরে ঐ দু'টো কাঁচের বাক্স রেখেছিস কেন?,

ডিল্টু ঃ পাম্প করে ভিতরে বাক্সটার মধ্যেকার হাওয়া বের করেছি যাতে ওর বিদ্‌ঘুটে শব্দটা না হয় এবং

বাইরে আর একটা কাঁচের বাক্স রেখেছি যাতে বিন্দুমাত্র শব্দ না হয়। জানিস্ তো যে পরপর ঘন এবং লঘু ও আবার ঘন মাধ্যম থাকলে শব্দ সব কটা মাধ্যম ভেদ করে বাইরে আসতে পারে না।'

আবার প্রশ্ন ঃ জেনারেটারের চুম্বক ঐ ঘড়ির মতো যন্ত্রটার হেয়ার-স্প্রিং নষ্ট করে দেবে না ?

উত্তর ঃ সেইজন্যেই তো অচৌম্বক পদার্থ দিয়ে ঘূর্ণায়মান দণ্ডটা তৈরী করেছি আর জেনারেটার ও যন্ত্রটার মাঝে পরপর দুটো বড় বড় কাঁচা লোহার পাত রেখেছি। চুম্বকের বলরেখা কাঁচা লোহাকে যে ভেদ করতে পারে না তা তো সকলেই জানে।

প্রশ্ন ঃ তোর যন্ত্রটা একটানা কতক্ষণ চলবে ?

উত্তর ঃ তার উত্তর তো আগেই দিয়েছি ! একটানা চার ঘণ্টা চলবে। দম দিলে আবার চার ঘণ্টা।...

এবার ডিণ্টুর বাবা বললেন ঃ 'যাই বড় গরম লাগছে, একটু পাখার তলায় বসি গে।'

অমনি ডিণ্টু বলে উঠলো, 'পাখা তো চলবে না।' সবাই অবাক। ডিণ্টুই উত্তর দিল, 'আমাদের লাইন A.C. কিন্তু ইনডাকশন কয়েল তো D. C. তৈরী করে। ফলে পাখা নট্ নড়নচড়ন।

ব্যাপারটা আমি ভালো করে না বুঝতে পারায় ও আমাকে একটা মালবাহী চতুষ্পদের নামে ভূষিত করে বললো, এই অঞ্চলের পাখায় যে মোটর আছে তা A. C. মোটর। D.C. তে A.C. মোটর চলে না।

রাত হয়ে আসছে দেখে এরপর আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

বারাসত সরকারী মহাবিদ্যালয়।

নকল রক্ত

দেবব্রত রায়

আমাদের সকলের শরীরেই তো রক্ত রয়েছে। সকলেরই রক্তের রঙ লাল। তবুও রক্তকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন A ; B ; AB ; O। এক গ্রুপের রক্ত যদি অন্য গ্রুপের রক্তের সঙ্গে মিশে যায় তা হলে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ ব্লাড ব্যাঙ্কে বিভিন্ন শ্রেণীর রক্ত আলাদা আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হয়। এই হলো আমাদের আসল রক্তের ব্যাপার।

'নকল রক্ত' কথাটা শুনতেই যেন কেমন লাগছে—তাই না ? অনেক কিছুই নাকি নকল হয় শুনেছি। রক্তও হয় নাকি ? হ্যাঁ, হয়। তা হলে সরাসরি বলেই ফেলি। ফ্লোরিন [F_2] আর কার্বন [C] মৌল মিলে একটা যৌগ তৈরী হয়। নাম তার 'ফ্লুরোকার্বন'। এর সঙ্গে মেশানো হয় লবণ জল আর গ্লুকোজ—আর তারপর এর মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় আলট্রাসোনিক সাউণ্ড। ফলে ঐ ফ্লুরোকার্বন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গিয়ে একটা সাদা মতন মিশ্রণ তৈরী করে। ব্যাস্, তৈরী হলো কৃত্রিম রক্ত।

তবে হ্যাঁ, সরাসরি এর প্রয়োগ হয় না। আগে এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ঢুকিয়ে তারপর মানুষের শরীরে প্রয়োগ করা হয়। সবচেয়ে আসল যা তা হলো এই রক্তচালনায় ব্লাড-গ্রুপ দেখার কোনো দরকারই করে না।

বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, বাঁধ রোড়, পো ও জেলা-মালদা

বিচিত্র কফিন

উত্তমকুমার দাশ

1893 খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ায় এক গর্ভবতী মহিলা মারা গেলে তাকে কবর দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে, যখন সন্দেহ করা হলো, মহিলার স্বামী তাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে, তখন তদন্তের জন্যে কবর খুঁড়ে মৃতদেহটি তুলে আনতে গিয়ে দেখা গেল, সেই মহিলা কফিনের মধ্যে একটি সন্তান প্রসব করেছে। এবং মহিলার ভাবভঙ্গি দেখে এও বোঝা গেল, সে আগে মারা যায় নি। কফিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে না পারায় সে যে খুব কষ্ট পেয়েছে, সে চিহ্ন তার চোখে মুখে স্পষ্ট। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হলো না ভুল চিকিৎসার ফলেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।

নাড়ির গতি খুব ক্ষীণ হয়ে গেলে এমনি ভুল চিকিৎসা কখনো সখনো হয়। এমনিভাবে ভুল চিকিৎসার ফলে যাতে কোন মানুষের অকাল মৃত্যু না ঘটে, সেজন্যে নোবেল পুরস্কারের প্রবাদপুরুষ আলফ্রেড নোবেলের পিতা বিজ্ঞানী ইমানুয়েল স্ব-আবিষ্কৃত প্লাইউড দ্বারা একপ্রকার কফিন তৈরি করেছিলেন। এতে তিনি বাতাস চলাচলের জন্যে ব্যবস্থা করা ছাড়াও অত্যন্ত সুকৌশলে ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে জ্ঞান ফিরে পেলে কবরস্থ মানুষ মর্ত্যের মানুষকে তার জীবিত থাকার কথা জানিয়ে উদ্ধার প্রার্থনা করতে পারে।

52 মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-54

অন্তবর্তী সংযোগ

কাকলি রায়

আজ পর্যন্ত যে সকল জীবাশ্মভূত জীব জগতে পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে আশ্চর্যতম হলো টেরিডোস্পার্মের (Pteridosperm) মতো জীবেরা। টেরিডোস্পার্মের গঠন একাধারে ফার্ন ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের মতো। ফার্ন হলো অপুষ্পক উদ্ভিদ। এদের শুধু মূল, কাণ্ড ও পাতা থাকে। কিন্তু দেবদারু, পাইন, বিলাতী ঝাউ-এর মতো ব্যক্তবীজী উদ্ভিদেরা সপুষ্পক; যদিও এদের ফুলের শুধু একটি স্তবক (পুংকেশর বা গর্ভকেশর) থাকে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সৃষ্টির আদি পর্বে ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদরা উন্নততর ব্যক্তবীজীদের পূর্বে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল। জীববিজ্ঞানীরা বলেন, টেরিডোস্পার্মের উদ্ভব পৃথিবীতে ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের আবির্ভাবেরই সূচনা। এইরকম যে সকল জীবের দৈহিক গঠনে দুই ভিন্ন শ্রেণীর জীবের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় দেখা যায় ক্রমবিবর্তনের ধারায় তারা অন্তবর্তী সংযোগরূপে গণ্য হয়।

তোমরা হয়তো ভাবছ ক্রমবিবর্তনটা কি? আজ যেসব গাছপালা, প্রাণী দেখতে পাচ্ছ তারা সবাই একই সঙ্গে পৃথিবীতে আসে নি। এককোষী স্বভোজী জীবের জন্মে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের স্পন্দন হয়েছিল। তারপর এলো এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণী। এরপর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একে একে উদ্ভূত হয় শৈবাল, ছত্রাক, মস, ফার্ন, ব্যক্তবীজী, গুপ্তবীজীরা এবং প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রথমে অমেরুদণ্ডী ও পরে মেরুদণ্ডীরা। অনেক অনেক বছর পরে নানা কারণে পৃথিবীর পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক জীব এই নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে অবলুপ্ত হয়েছে। পালিলিক শিলাস্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্ম থেকে আমরা এদের অনেকের কথা জানতে পারি। আবার নব পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনক্ষম নতুন জীবের সৃষ্টি হয়েছে। এদের দৈহিক গঠন পূর্ববর্তীদের চেয়ে জটিলতর হত। এইভাবেই অব্যাহত থেকেছে সৃষ্টির ধারা অর্থাৎ ক্রমবিবর্তন। বিবর্তনের ক্রমনির্ণয়ে পূর্বোক্ত অন্তবর্তী সংযোগরক্ষাকারী জীবদের ভূমিকা অসামান্য। এদের কথা একটু বিশদভাবে বলি।

ডিপ্লোভার্টিব্রন (Diplovertebron) ও সেম্যুরিয়ার (Seymuria) জীবাশ্ম দেখে অবাক হলেন বিজ্ঞানীরা। ডিপ্লোভার্টিব্রনের দৈহিক গঠন অংশত মাছ ও উভচর এবং সেম্যুরিয়ার গঠনে উভচর ও সরীসৃপের মিলিত বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। বলা হলো ডিপ্লোভার্টিব্রন মাছ ও উভচরের এবং সেম্যুরিয়া উভচর ও সরীসৃপের মধ্যের অন্তবর্তী সংযোগ। এ থেকে বিজ্ঞানীর-মেরুদণ্ডীর বিবর্তনের ক্রম নির্ণয় করলেন এইভাবে ঃ মাছ→উভচর→সরীসৃপ।

1871 সালে ব্যাভিরিয়ায় আর্কিওপটেরিক্স (Archaeopoteryx) নামক এক বিচিত্র প্রাণীর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত

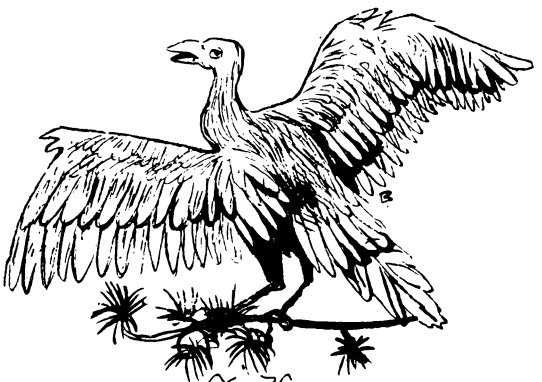

আর্কিওপটেরিক্স

হলো। আমাদের অতি পরিচিত সরীসৃপ, কুমীর, গিরগিটির মতো এর দন্তযুক্ত চোয়াল ও লেজ ছিল। দাঁড়াও দাঁড়াও, তাই বলে এক্ষুনি একে যেন কুমীরের জাতভাই সরীসৃপ ভেবে বসো না! এদের আবার পাখীর মতো পালকাবৃত ডানা, নখরযুক্ত আঙ্গুলিও ছিল। তা হলে আর্কিওপটেরিক্সকে আমরা কি বললো—সরীসৃপ না পাখী? সরীসৃপ অপেক্ষা উন্নততর প্রাণী পাখীর পৃথিবীতে আবির্ভাবের বার্তা বহন করে এনেছিল এই আর্কিওপটেরিক্সরা। এরা হলো সরীসৃপ ও পাখীর মাঝামাঝি অবস্থা অর্থাৎ এই দুই শ্রেণীর অন্তবর্তী সংযোগ।

অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে আজও হংসচঞ্চু নামক এক অদ্ভুত প্রাণী দেখা যায়। হংসচঞ্চুরা সাপ, কচ্ছপ এইসব

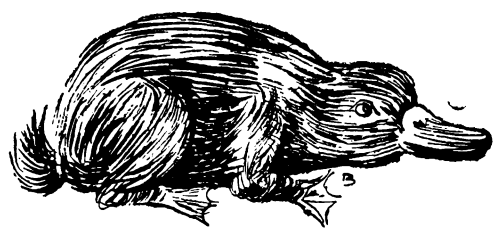

হংসচঞ্চু

সরীসৃপদের মতো ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বার হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ন্যায় সমস্ত দেহ লোমাবৃত। ঘোড়া, বানর ইত্যাদি স্তন্যপায়ীদের মতো এদের বাচ্চারাও মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। এবার বোধ হয় তোমরা সমস্বরে বলে উঠবে যে, তা হলে হংসচঞ্চু হলো সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর অন্তবর্তী সংযোগ।

E/7 গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টার্স, সি. এন. রায় রোড, কলি-39

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত নবম ও দশম শ্রেণীর রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম ঃ
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, দশম শ্রেণী।
কানাইলাল বিদ্যামন্দির, চন্দননগর, হুগলী।
রচনা রবার্ট ও হারাবার্ক।
ভৌগোলিক আবিষ্কারের কথা।

দ্বিতীয় ঃ
রত্না তিয়াড়ী, দশম শ্রেণী।
নন্দীগ্রাম ব্রজমোহন তিয়াড়ী বালিকা বিদ্যালয়, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর।
রচনা—বিরল প্রাণী

তৃতীয় ঃ
রামপ্রসাদ দাস, নবম শ্রেণী।
মাটিয়ারী আর, পি, সেন, বিদ্যালয়, মাটিয়ারী নদীয়া।
রচনা মহাকাশ গবেষণা।

সফল প্রতিযোগীদের ডাকযোগে সম্মানমূল্য ও মানপত্র পাঠানো হচ্ছে।

বিচারকমণ্ডলী ঃ অমরনাথ রায়, অজয় হোম ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২.৫০ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২৫ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। **under certificate of posting**-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- **M. O.** বা **Bank Draft KISHORE JNAN-BIJNAN**-এর নামে পাঠাতে হবে।

যারা এখনো গ্রাহক কার্ড রিনিউ করেনি, তাদের রিনিউ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

শব্দকূট

বিশ্বজিৎ সরকার

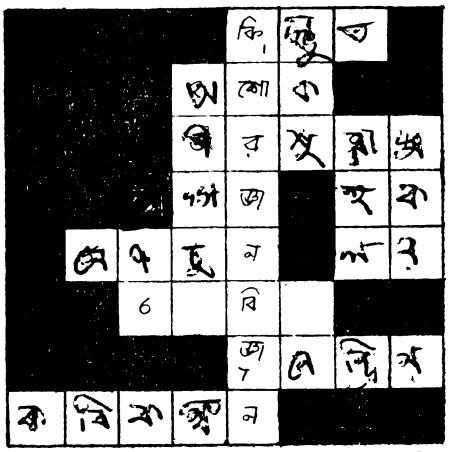

পাশাপাশি

1. প্রাচীন বন্যজাতি। 2. মৌর্য সম্রাট। 3. বাংলা সাহিত্যকের ছদ্মনাম। 4 বিশ্বকর্মার কন্যা। 5. সৌরজগতের একটি গ্রহ। 6. পদ্মের নাম। 7. যে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যবিষয়ের বোধ হয়। 8. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর আখ্যা।

উপর নিচ

9. বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র। 10. রাশির নাম।

গত সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান

১ অ্যা	২ মো	৪ নি	যা	
	না	৩ কো	ল	ন
	জা	৬ টি	ন	
৫ পা	ই	ন		৪ শী
	৭ ট	ন		ল

যা আমি দেখেছি

পিঁপড়ের লড়াই

জ্যোতিষ সরকার

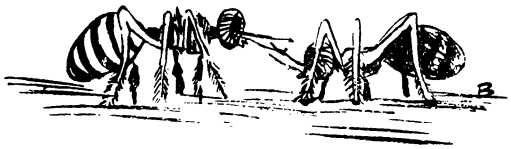

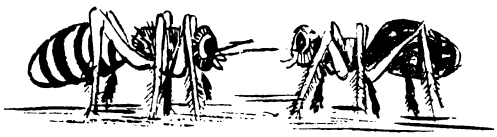

সেদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরের বারান্দায় দেখলাম একটা কালো আস্তরণের মতো কি যেন। মা অনেক সকালেই ঘুম থেকে উঠে কাজ করছিলেন। মাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ওগুলো কালো রঙের কাঠ পিঁপড়ে। কাছে গিয়ে দেখি সত্যি তাই তো! অসংখ্য কালো পিঁপড়ে ছেয়ে আছে বারান্দায় অর্ধেকটা। স্বভাবতঃই একটা কৌতূহল হলো—ওরা কি করছে? মা এর আগে নাকি একবার ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন, অথচ আবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবাই জড়ো হয়ে যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেছে। সেইজন্যে জানবার ইচ্ছেটা একটু বেশি হলো। কিন্তু ঘুমজড়িত চোখে তখন বিশেষ কিছু বুঝতে পারলাম না।

হাতমুখ ধুয়ে এলাম। কিন্তু না, কিছুই বুঝতে পারছি না। ভাবলাম এমনই জড়ো হয়েছে। নিজেরাই চলে যাবে। ওখান থেকে পড়ার টেবিলে চলে এলাম। ঘণ্টা-খানেক পরে রান্না ঘরে খেতে যাবার সময় দেখি, কি আশ্চর্য! পিঁপড়েগুলো যেমন তেমনিই আছে। এইবার আমার দৃঢ় সন্দেহ হলো নিশ্চয়ই কিছু করছে ওরা, নইলে অমন করে থাকতেই পারে না। খেয়েদেয়ে এসে কাছে বসে ভালো করে চোখ রাখলাম।

পিঁপড়েগুলো দু'রকমের। একদল কালো এবং অপর-গুলো খয়েরী রঙের। কালো পিঁপড়েগুলো অপেক্ষাকৃত একটু বড়ো আকৃতির। অসংখ্য পিঁপড়েগুলোর মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মুখোমুখি জোড়া লেগে আছে। ভালো করে দেখি, যে পিঁপড়েগুলো এদিক ওদিক ঘুরছে, তারা মুখো-মুখী হয়ে গেলেই দাঁড়িয়ে পড়ছে চুপচাপ। তারপর দু'জন পরস্পরকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। যাত্রা বা নাটকের সময় যেমন দেখা যায় দু'জন যোদ্ধা তরবারী নিয়ে যুদ্ধ করছে, ঠিক যেন সেইভাবে পিঁপড়েগুলো সামনেকার শুঁড় ঘুরিয়ে যুদ্ধে আহ্বান করছে। তবে সুযোগ পেলে পাশের দিক থেকেও আক্রমণ করতে যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে দুটো পিঁপড়ে লড়াই চালাচ্ছে, সেখানে তৃতীয় কোনো পিঁপড়ে এসে নাক গলাচ্ছে না বা কোনো পক্ষকে সাহায্য করছে না। আরো ভালো করে দেখলাম একই রঙের পিঁপড়েরা কখনই লড়াই করার চেষ্টা করছে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দু'টি বিপরীত রকমের পিঁপড়ের মধ্যে লড়াই চলছে। ওদের যুদ্ধের শেষ কিন্তু ওখানেই নয়। 'তরবারী' ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ একটা পিঁপড়ে মুখ দিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখ কামড়ে ধরল, সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই স্থির। এখন বুঝলাম যে জোড়গুলি কিছুক্ষণ থেকে দেখছি তাদের মধ্যে আসলে নীরব যুদ্ধ চলছে। কোনো জোড়ের মধ্যেই একই ধরনের পিঁপড়ে দেখতে পেলাম না। দুটো দু'রঙের অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে তাকে 'বর্ণ-সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ' বলা যেতে পারে।

স্কুলে যাবার আগে দেখলাম যুদ্ধ পুরোদমেই চলছে, আর আগের চেয়ে অনেক বেশি পিঁপড়ে যুদ্ধে লেগে গেছে। তবে অনেকেই ক্লান্ত হয়ে 'রণভঙ্গ' দিয়ে (হয়তো) বাড়ির দিকে চলছে।

বিকেলে বাড়িতে আসার পরে মনে পড়ল ওদের কথা। তাড়াতাড়ি গেলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ তখন থেমে গেছে। অনেক পিঁপড়ে মরে গেছে আর দু' চারটে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। মরা পিঁপড়েদের লক্ষ্য করে দেখলাম সেগুলি সবই খয়েরী রঙের পিঁপড়ে। তার মানে 'কালো পিঁপড়েরাই আজকের যুদ্ধে জয়লাভ করল।

আশ্চর্য লাগছে এখানেই যে, মানুষদের যুদ্ধের মতোই তাদের যুদ্ধ, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে যুদ্ধ করে—যে নিয়মগুলো মানুষজাতির যুদ্ধের নিয়মের মতো।

গ্রাঃ-নেতাজী পল্লী, পোঃ-খড়িবাড়ী, জেলা-দার্জিলিং।

জানা-অজানা

চন্দনকুমার রুদ্র

বাতিমাছ

আলাস্কাতে একপ্রকারের মাছ পাওয়া যায়। এই মাছকে রোদে শুকিয়ে নিয়ে তার লেজে আগুন ধরিয়ে দিলে ঠিক মোমবাতির মতো জ্বলে। তাই ঐ অঞ্চলের লোকেরা ঐ মাছকে বাতিমাছ নাম দিয়েছে। এই মাছ এইরূপ জ্বলবার কারণ হলো এদের শরীরে তেলের অংশ খুব বেশী। ঐ দেশের লোকেরা এই মাছ খেতে খুব ভালোবাসে। অনেক সময় লোকেরা এই মাছের ওপর নরম পাথর ফেলে তেল বের করে থাকে। এদের তেল চর্বির মতো জমে যায় এবং তা নাকি বহুদিন সঞ্চয় করে রাখা যায়। ঐ দেশের লোকের কাছে এই মাছ খুবই জনপ্রিয়।

যে প্রাণী ফুল দিয়ে ঘর সাজায়

আমরা জানি ফুল দিয়ে ঘর-বাড়ি একমাত্র মানুষই সাজিয়ে থাকে। কিন্তু না, শুধু মানুষই নয়। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন, নিউগিনির জঙ্গলে মালী পাখি (Gardener bird) নামক এক ধরনের পাখিও নাকি মানুষের মতো তাদের ঘর ফুল দিয়ে সাজায়। এরা বিভিন্ন লতাপাতা খড়কুঁটো দিয়ে তারা ঘরের মতো তৈরী করে এবং ঘরের সামনে কিছু জমিতে রঙিন ফুল দিয়ে বাগান সাজায়। ফুল ছাড়াও এরা ঝিনুক ও অন্যান্য জিনিস দিয়েও নাকি ঘর সাজায়। সাজানোর সময় এরা নানাভাবে সাজিয়ে দেখে কোন ভাবে সাজালে দেখতে সুন্দর হয়।

দুগ্ধবৃক্ষ

দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা রাষ্ট্রে এক ধরণের বৃক্ষকে Cow-tree বলা হয়। একে বাংলায় দুগ্ধ-বৃক্ষ বলা হয়ে থাকে। এই গাছের বৈজ্ঞানিক নাম হলো ব্রোসিমাম্‌গ্যাল্যাক টোডেনড্রন-(Brosimum galac teden-dron)। এটি Moraceae গোত্রের উদ্ভিদ। এই গাছের কোন অংশ ছেদন করলে ঐ ক্ষতস্থান থেকে যে তরুক্ষীর (Latex) নির্গত হয় তা ভেনেজুয়েলার স্থানীয় অধিবাসীরা দুধের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে।

পেয়ারাবাগান, পোঃ-বাঁশদ্রোণী, 24 পরগণা।

সৌমিত্র মজুমদার

1. পচা ডিম জলে ভাসে কেন?

—ডিম পচে গেলে তার মধ্যেকার পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে ডিমের খোসার অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে বার হয়ে যায়। এতে ডিমের ওজন কমে যায় ও তা সমপরিমান জলের চেয়ে হালকা হয়ে যায়। তাই পচা ডিম জলে ভাসে।

2. গরুর কেবল নাকটি ঘাম হয় কেন?

—নাক ছাড়া দেহের অন্যত্র কোথাও স্বেদ গ্রন্থি নেই বলে কেবল গরুর নাকেই ঘাম হয়।

3. চুল কাটলে বেদনা হয় না কেন?

—চুলের মধ্যে কোন স্নায়ু নেই। কাজেই চুল কাটলে আমাদের স্নায়ুতে কোন আঘাত লাগেনা এবং আমরা বেদনা বোধ করিনা।

4. কতদূর পর্যন্ত বাতাস আছে?

—পৃথিবী থেকে প্রায় পাঁচশ মাইল দূর পর্যন্ত বাতাস আছে।

5. রুপোর বাসন কালো হয়ে যায় কেন?

—শহরের বাতাসে ও আমাদের গায়ের ঘামে গন্ধক থাকে। গন্ধকের সংস্পর্শে এলে রুপো কালো হয়ে যায়।

6. মোমবাতি কি মোম দিয়ে তৈরী?

—না, এটি প্যারাফিন দিয়ে তৈরী।

7. মিউজিয়ামে মৃত:পোকামাতড় ও কিছু জীবজন্তু একপ্রকার স্বচ্ছ তরলে রেখে দেওয়া হয় এর নাম কি?

—ফরম্যালডিহাইড।

8. কোন্ উদ্ভিদ বারো ঘণ্টা অন্তর অন্তর ওজনে দ্বিগুন হয়?

—ক্লিউফিলা।

73, পূর্বাঞ্চল পল্লী, রহড়া, 24 পরগণা।

আহ্-হ!
নিমো এবং কনসীলের শুশ্রূষায় লোকটির জ্ঞান ফিরে এল।
ক্যাপ্টেন নিমো তাকে থলেভর্তি মুক্তো দিলেন।
তটরেখায় ফিরে এসে নিমো তাঁর সাথীদের নিয়ে চড়লেন নটিলাসের নৌকায়।
প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ নেড।
এ আমার প্রতিদান ক্যাপ্টেন। আমি ভুলিনি-আপনি আমাদের বাঁচিয়েছিলেন।
নটিলাসের যাত্রা শুরু হল। নিমোর গলায় এবার অদ্ভুত একআবেগ লক্ষ্য করলেন অধ্যাপক।
যে মুক্তো শিকারীর প্রাণ আমরা বাঁচালাম সে হচ্ছে নির্যাতিত ভারতবর্ষের অধিবাসী। আমি আজীবন ওদের বন্ধু হয়েই থাকব।
ভারতবর্ষের বুকে ইংরেজদের অমানুষিকতার ইঙ্গিত করছেন ক্যাপ্টেন। শুধু জলভাগই নয় স্থলভাগের খবরও তাহলে উনি রাখেন!
মিংহলকে দূরে ফেলে নটিলাস অতিক্রম করল আরব সাগর।
ভূমধ্য সাগর
সুয়েজখাল
লোহিত সাগর
সৌদি আরব
বাবেলমান্ডেব
সোমালিয়া
এডেন উপসাগর
এবার আমরা বাবেলমান্ডেব প্রণালী হয়ে লোহিত সাগরে পৌঁছব।
লোহিত সাগর থেকে আমরা কোথায় যাব ক্যাপ্টেন?
33

পরশু আমরা ভূমধ্য সাগরে পৌঁছব।
আপনি কি নটিলাসকে সুয়েজ খাল দিয়ে নিয়ে যাবার কথা ভাবছেন?
আমরা যাব সুয়েজ খালের অনেক নীচে এক ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে।
এ আপনি কী বলছেন?
হ্যাঁ অধ্যাপক, অনেক আগেই এই আশ্চর্য সত্যটি আমি আবিষ্কার করেছিলাম।
এসে গেল সেই প্রত্যাশিত মুহূর্ত।
A1-23
দেখুন দেখুন মঁসিয়ে অ্যারোনেক্স, আমরা সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে পড়লাম।
ক্যাপ্টেন নিমো নিজের হাতে ধরলেন নটিলাসের নিয়ন্ত্রণ।
ঘাম ছুটছে তাঁর সারা দেহে।
ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিটের মাথায় আমরা ভূমধ্য সাগরে পড়লাম।
ভয়ঙ্কর সুন্দর এক রাজ্যের ভিতর দিয়ে সর্পিল গতিতে এগিয়ে চলেছে নটিলাস। নিয়ন্ত্রণের সামান্যতম ত্রুটি হলেই অবধারিত মৃত্যু।
হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন...
34

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল